আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভী
ইসলাম
ও
শিল্পকলা

আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভী

ইসলাম ও শিল্পকলা

অনুবাদ

ড. মাহফুজুর রহমান
অধ্যাপক, আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

খায়রুন প্রকাশনী
বিক্রয় কেন্দ্র ঃ বুক্স এন্ড কম্পিউটার মার্কেট (২য় তলা)
দোকান নং- ২০৯, ৪৫ বাংলাবাজার, ঢাকা -১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫৯৮২, ৮৩৫৪১৯৬, ০১৭১৫-১৯১৪৭৭, ০১৬৭-০৮২৭০০২

ইসলাম ও শিল্পকলা
মূল ঃ আল্লামা ইউসুফ আল-করযাভী
অনুবাদক ঃ ড. মাহফুজুর রহমান

প্রকাশকাল ঃ
প্রথম ঃ জুন ২০০৭ ॥
জমাদিউস সানি ১৪২৮ ॥
আষাঢ় ঃ ১৪১৪ ॥

প্রকাশক ঃ
মোস্তাফা রশিদুল হাসান
খায়রুন প্রকাশনী

প্রচ্ছদ ঃ
আবদুল্লাহ জুবাইর

শব্দ বিন্যাস ঃ
১০/ই-এ/১, মধুবাগ,
মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

মুদ্রণ ঃ
আফতাব আর্ট প্রেস,
২৬- তনুগঞ্জ লেন, ঢাকা

মূল্য ঃ ৭০ .০০ টাকা

ISBN—984-8455-57-18

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহিম

অনুবাদকের কথা

বর্তমানে সারা বিশ্বে ইসলামকে মোটামুটি তিনটি ধারায় উপস্থাপন করা হচ্ছে। প্রথম ধারার লোকেরা এখতিয়ার বা সাবধানতার নামে ইসলামকে কঠোর ভাবে উপস্থাপন করছেন। তাঁরা সব সময় সাবধানতার নামে সহজ নীতি পরিহার করে কঠোর নীতি অবলম্বন করেন, ফলে তাদের ইসলাম কতগুলো সাবধানতার সমন্বিত রূপে পরিণত হয়েছে। সেখানে কঠোরতা ও সংকির্ণতা ছাড়া সহজতা বলতে কোনো কিছুর স্থান নেই। অথচ আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের জন্য সহজনীতি ও প্রশস্ত বিধান কামনা করেন। আর মহানবী (স) কে যখন কোনো দুটি বিষয়ে এখতিয়ার দেয়া হতো তখন তিনি দুটির মধ্যে সহজটিই গ্রহণ করতেন, যদি তাতে গুনাহ ও পাপ হওয়ার সম্ভাবনা না থাকত— (বুখারী মুসলিম)। কিন্তু তাঁরা তা না করে সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, আইম্যায়ে মুখতাহেদীন ইসলামকে যেভাবে গ্রহণ করেছেন ও দেখেছেন সেভাবে গ্রহণ না করে মুতাআখ্‌খেরীনরা তথা পরবর্তী কালের লোকেরা ইসলামের যেভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন সে ভাবেই ব্যাখ্যা দেন এবং সেভাবেই গ্রহণ করেন। তাঁরা ইসলাম সরাসরি পবিত্র কুরআন ও হাদীস হতে না শিখে বরং মুতাআখ্‌খেরীন তথা পরার্তীকালের আলেমদের বই-পুস্তক পড়ে শিখেন, ফলে তাদের উপস্থাপিত ইসলামে কোনো সহজনীতি নেই, কোনো সহজ বিধান নেই। তারা যাকে ইসলাম মনে করে আসছে তা আসলে ইসলামের শিক্ষা কিনা, তাদের ইসলাম পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীস নির্ভর কিনা তা যাচাই করে দেখতেও তারা রাজী নয়। এমন কি তাদের উপস্থাপিত ইসলাম মানুষের কাছে অগ্রহনীয় হলেও। তারা যা ইসলাম মনে করে তা সকলকে ইসলামী বিধান হিসেবে মেনে নিতে হবে এটাই তাদের ধারণা এবং মানসিকতা। কেউ পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে চাইলে তাতেও তাদের আপত্তি। এঁদের উপস্থাপিত ইসলাম দেখে মানুষের মধ্যে ইসলাম প্রীতি সৃষ্টি হয় না। ইসলাম ভীতিই সৃষ্টি হয়। কিন্তু এ ব্যাপারে তাদের কোনো অনুভূতি নেই। তারা ভাবেনা আল্লাহ্‌র দ্বীন ইসলামের এরূপ উপস্থাপনের ফলে স্বয়ং মুসলমানদের মধ্যেই অনেকে ইসলামকে এ যুগে বাস্তবায়ন যোগ্য মনে করছেনা। এর ফলে তারা ইসলাম বাদ

দিয়ে রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি শিক্ষানীতি ইত্যাদিতে বিদেশী নানা মতবাদ ও ইজম আমদানী করার চেষ্টা করছে। এরূপ বিশ্বাস ও কর্ম-কাণ্ডের ফলে তারা নিজেদের অজান্তেই ইসলাম হারা হয়ে যাচ্ছে।

এধরনের ইসলামের উপস্থাপকগণ সব সময় কঠোরনীতি অবলম্বনের পক্ষে। তাদের কাছে নতুন সব কিছুই হারাম, নাজায়েয, অবৈধ এবং মাকরুহ। তারা না ভেবেই যে-কোনো কিছুকে হারাম অবৈধ ও নাজায়েয বলতে স্বাচ্ছন্দ বোধ করে। অথচ আল-কুরআনের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, অতীতের কিছু মানুষের এ জাতীয় প্রবণতায় আল-কুরআন তীব্র ভাষায় নিন্দা করেছে।

আর অতীতের মুজতাহিদ ও ফকীহদের সিদ্ধান্ত হলো, যে কোনো বস্তু মূলত বৈধ। অবৈধ হবার মতো দলিল পাওয়া না যাওয়া পর্যন্ত তাকে বৈধ বলে সিদ্ধান্ত দিতে হবে। লেনদেন ব্যবসা-বাণিজ্য চুক্তি-সন্ধি ইত্যাদির ক্ষেত্রেও ব্যাপার একই। তবে এবাদত-বান্দেগী ও অকীদার ক্ষেত্রে যে-কোনো কিছু আল-কুরআন এর সুস্পষ্ট বক্তব্য ও সহীহ্ হাদীস এর সমর্থন ছাড়া বৈধ ও গ্রহণযোগ্য এবং বিশ্বাস যোগ্য নয়। এতদসত্ত্বেও এ শ্রেণীর লোকেরা হারাম ও অবৈধ বলতে স্বাচ্ছন্দ বোধ করেন। যখন এদেশে প্রথম রেলগাড়ী আসে তখন তারা ফতোয়া দেন রেলগাড়ীতে সালাত আদায় করা অবৈধ। আবার যখন উড়োজাহাজ আসে তখন ফতোয়া দেন উড়োজাহাজ আকাশে চলন্তাবস্থায় নামায আদায় অবৈধ। আবার যখন টিসু পেপার আসে তখন ফতোয়া দেন টিসু পেপার দিয়ে ডিলা কুলুপ করা অবৈধ। কিন্তু পরে আবার সব কিছু বৈধ হয়ে যায়।

শিল্পকলার ব্যপারে এদের অবস্থান সব সময় নেতিবাচক। এ কারণেই শিল্পকলার সাথে সংশ্লিষ্ট লোকেরা বরাবরই ইসলামকে তাদের পেশার শত্রু ভাবে। এসব লোকেরা ইসলামের আলোকে শিল্প কলাকে নির্দেশনা না দিয়ে ফতোয়া দিয়েই শেষ। ফলে শিল্পকলার সাথে ইসলামের বৈরী সম্পর্ক বলে ধরে নিয়েছে অনেকেই। অথচ যুগে যুগে ইসলাম সহ সব ধর্ম ও মতবাদ শিল্পকলাকে অবলম্বন করেই প্রচারিত ও বিকশিত হয়েছে। শিল্পকলারও উন্নয়ন ঘটেছে ধর্মকে লালন করেই।

আর এক শ্রেণীর মানুষ পাশ্চাত্যবাসীকে খুশী করার জন্য পাশ্চাত্যবাসী ইসলামের যেরূপ ব্যাখ্যা ও উপস্থাপনা চায় তারাও সেভাবে ইসলামকে উপস্থাপন করে। তারা এতদুদ্দেশ্যে আল-কুরআনের বিভিন্ন সুস্পষ্ট আয়াতের এমন সব আজগুবি ও মনগড়া ব্যাখ্যা দেয় যা অতীতের সাহাবায়ে কেরাম তাবেঈন আইম্মায়ে মুখতাহেদীন দেননি। আরবী ভাষাও তা সমর্থন করেনা। তারা তাদের উদ্দেশ্যের সাথে সাংঘর্ষিক হলে বুখারী মুসলিমের মতো সহীহ

হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত সহীহ হাদীসও প্রত্যাখ্যান করে। আর তাদের উদ্দেশ্য ও ব্যাখ্যা সমর্থন করলে দুর্বল হাদীস এমন কি জাল হাদীস গ্রহণ করতেও দ্বিধা করেনা। বিজ্ঞানমনস্ক পাশ্চাত্যবাসীরা নবী-রাসূলদের মুজিয়া অস্বীকার করে বলে এসব লোকেরা পবিত্র কুরআনের উল্লেখিত নবী-রাসূলদের মুজিযা গুলোর আযগুবি ব্যাখ্যা দেয় আর রাসূল (স)-এর বিভিন্ন মুজিযার বিবরণ সম্বলিত বর্ণিত সহীহ হাদীসগুলোও অস্বীকার করে। অনেকেই ইন্দ্রয়ানুভুত নয় বলে ফেরেশতা ও জ্বিনের অস্তিত্ব পর্যন্ত অস্বীকার করে।

তারা পাশ্চাত্যবাসীকে খুশী করার জন্য কখনও বাংকের সুদকে সুদ বলে স্বীকার করতে চায়না, আবার কখনও পবিত্র কুরআনে উল্লেখিত নারীর হিজাব ও মুসলিম উত্তরাধিকার আইনে নারীর প্রাপ্য অংশকে অস্বীকার করে অপব্যাখ্যার মাধ্যমে তাকে পুরুষের সমান বানাবার অপপ্রয়াস চালায়। তারা ইসলামে নারী-পুরুষকে সর্ব ক্ষেত্রে সমান অধিকার দেয়া হয়েছে একথা বলে পুরুষকে দেয়া তালাকের অধিকার, তার বিপরীতে নারীর প্রাপ্য ফরয দেন মহরকেও অস্বীকার করতে চায়। তারা ইসলামের জিহাদ কে সন্ত্রাসবাদ জঙ্গিবাদ ইত্যাদির সাথে একাকার করে ইসলামের ফরয জিহাদকেও অস্বীকার করতে চায়। তারা পাশ্চাত্যের গণতন্ত্র ধর্মনিরপেক্ষবাদ পুঁজিবাদ সমাজবাদ ইত্যাদিকে ইসলামের লেবাস পরিয়ে ইসলামের নামে চালাতে চায়। তাদের ইসলামের এরূপ ব্যাখ্যা পাশ্চাত্যবাসীকে সন্তুষ্ট করলেও তার সাথে রাসূলের আনা ইসলামের, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, আইম্মায়ে মুজতাহেদীনদের দেয়া ব্যাখ্যার কোনো সম্পর্ক নেই। এদের ধারণায় বর্তমান যুগে মুসলমানদের পশ্চাদপদতার জন্য দায়ী একমাত্র ইসলাম। অথচ ইসলামই একদিন অপরিচিত আরব জাতীকে গোটা দুনিয়ায় নেতৃত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের আসনে বসিয়েছিল। তাদের ধারণায় এখন মুসলমানদের অগ্রগতি ও উন্নতির একমাত্র সঠিক উপায় হলো জীবনের সকল ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের অনুসরণ। এ কারণেই তারা ইসলামকেও সেভাবেই সে উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করতে চায়। ইসলামের নামে পাশ্চাত্যের অনুকরণ অনুসরনকে মুসলমানদের কাছে গ্রহণযোগ্য করতে চায়।

তৃতীয় আর এক শ্রেণীর মানুষ পবিত্র কুরআন এবং সহীহ হাদীসে ইসলাম যেরূপ এসেছে সাহাবায়ে কেরাম তাবেঈন ও আইম্মায়ে মুজতাহেদীন ইসলামের যেরূপ ব্যাখ্যা দান করেছেন তারাও সেভাবে তার ব্যাখ্যা দেয়ার পক্ষপাতি। তারা সরাসরি পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসের দিকে প্রত্যাগমনের পক্ষপাতি। তারা মুতাআখখেরীন তথা যুগের আলেমদের দেয়া ইসলামের ব্যাখ্যা চোখ বুজে অন্ধভাবে গ্রহণ করার পক্ষপাতি নয়। তারা চায়না কারো অন্ধ অনুকরণ করতে।

তারা অতীত আলেম-ওলামাদের ইসলামের ব্যাখ্যা কুরআন হাদীসের আলোকে বিচার বিশ্লেষণ করে গ্রহণ করার পক্ষপাতি। তারা অধুনিক সৃষ্ট নতুন নতুন সমস্যাবলী ইজতিহাদের মাধ্যমে কুরআন সুন্নাহর আলোকে সমাধান করতে চায়। তারা পুরাতন ফিকহ্ শাস্ত্রকে নতুনভাবে যাচাই বাছাই করার পক্ষে, আর সব কিছু চোখবুজে অন্ধভাবে গ্রহণ করার পক্ষে নয়। কারণ তা কুরআন কিংবা হাদীস নয়। আর ঐ সব ফিকাহ্ শাস্ত্রের লেখক ফকীহগণও নিষ্পাপ মনুষ নন, তারা ভুল ত্রুটির উর্ধ্বেও নয়। তাই তাদের অভিমত কুরআন-সুন্নাহর আলোকে বিচার-বিশ্লেষণ করে গ্রহণ করার পক্ষপাতি। তারা সর্ব ক্ষেত্রে যোগ্য আলেমদেরকে ইজতিহাদের অধিকার দানের পক্ষপাতি। তা নাহলে সামষ্টিকভাবে বিশ্বের খ্যাতনামা আলেমদের একস্থানে বসে আন্তর্জাতিক সেমিনার ইত্যাদির মাধ্যমে সামষ্টিক ইজাতিহাদের পক্ষপাতি।

এখানে উল্লেখ্য যে, ইজতিহাদের দরজা বন্দ হয়ে গেছে এরূপ ঘোষণা দেয়া হলেও বাস্তব সত্য কথা হলো, যোগ্য লোকেরা প্রতি যুগেই ইজতিহাদ করে গেছেন। মালিকী মাযহাবের আবু বকর ইবনে আরবী, হানাফী মাযহাবের কামান ইবনে হুমাম, শাফেয়ী মাযহাবের ইয়যুদ্দিন আব্দুস সালাম, ইবনে দাকীকুল ঈদ, আসসাবাকী আল শাবীর, হাম্বলী মাযহাবের ইবনে তাইমিয়া, ইবনে কাইয়্যিম প্রমুখ আলেমগন স্বাধীনভাবে অনেক বিষয়ে তাদের অভিমত ব্যক্ত করে ইজতিহাদ করেছেন, বরং দশম শতাব্দীর জালালউদ্দিন সুয়ুতী দাবি করেছেন যে, তার ইজতিহাদের মুতলাকের ক্ষমতা ও যোগ্যতা আছে। দ্বাদশ শতাব্দীতে হানাফী মাযহাবের অনুসারী আল্লামা আহমদ ইবনে আবদুর রহিম তথা শাহ ওয়ালী উল্লাহর গ্রন্থ পাঠ করলে দেখা যায় যে, তিনি স্বাধীনভাবে ইজতিহাদ করেছেন। অসংখ্য বিষয়ে মাযহাব ছেড়ে কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

তেমনিভাবে ইয়ামানের কাজী উলফুজাত তথা প্রধান বিচারপতি আল্লামা শাওকানীকেও দেখা যায় যে, স্বাধীনভাবে কুরআন সুন্নাহর আলোকে তার নিজের অভিমত ব্যক্ত করে ইজতিহাদ করছেন।

আধুনিক যুগের অনেক আলেম এ পথ অবলম্বন করেছেন, মিসরের শেখ মুহাম্মদ আবদুহু, শেখ শালতুত, শেখ আবদুল হালীম মাহমুদ, শেখ জাদাল হক আলী জাদাল হক, শেখ মুহাম্মদ আল গাজালী, সৈয়দ কুতুব, সৌদি আরবের শেখ বুখাইত, শেখ আবদুল্লাহ বিন বায, একালের বিখ্যাত মুহাদ্দিস নাছির উদ্দিন আলবানী প্রমুখ আলেমগণও অনেক বিষয়ে ইজতিহাদ করেছেন।

আমাদের আলোচ্য গ্রন্থের লেখক আল্লামা ইউসুফ কারযাভীও এ ধারারই একজন মুজতাহিদ লেখক। তাঁর "আল ফাতাওয়া আল মুয়াসিরা", ইসলামের যাকাত বিধান, ইসলামে হালাল হারামের বিধান, বিশেষত আমার অনুদিত "ইসলামী শরীয়তের বাস্তবায়ন, বইটি পাঠ করলেই পাঠক এ সত্য অনুধাবন করতে পারবেন। এ গ্রন্থ পাঠ করলে পাঠক শিল্পকলা সম্পর্কে দীর্ঘ দিন হতে শুনে আসা কথাগুলো আল-কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে কতটুকু সত্য তা অবশ্যই অনুধাবন করতে পারবেন।

আমাদের বিশ্বাস আমরা যদি ইসলামকে আধুনিক সমাজে পুনরায় বাস্তবায়ন করতে চাই, ইসলামী আইন তথা ইসলামী শরীয়ত দ্বারা শাসিত হতে চাই, ব্যবসা-বাণিজ্য, লেন-দেন, শাসন ব্যবস্থা, ব্যাংক, বীমা ইত্যাদি তথা জীবনের সর্ব ক্ষেত্রে যদি ইসলামী বিধান অনুযায়ী চলতে চাই— যা আমাদের ঈমানের অন্যতম দাবী— তাহলে আমাদেরকে তৃতীয় এ দৃষ্টিভঙ্গিকেই সমর্থন করতে হবে। অতীত আলেমদের দেয়া ইসলামের ব্যাখ্যা পূণর্বিবেচনা ও যাচাই-বাছাই করে কুরআন সুন্নাহর আলোকে বিচার-বিশ্লেষণ করে গ্রহণ করতে হবে। অন্তত নতুন সৃষ্ট সমস্যার ক্ষেত্রে যোগ্য আলেমদের ইজতিহাদ করার অধিকারই নয় বরং ইজতিহাদ করার জন্য উৎসাহিতও করতে হবে। তাহলেই এ যুগে ইসলাম বাস্তবায়ন সম্ভব হবে। ইসলামী আইন-কানুন মেনে আধুনিক রাষ্ট্র ও দেশ পরিচালনা সম্ভব হবে। অন্যথায় কোনো মানুষের কাছে ইসলাম এ যুগে গ্রহণযোগ্য হবে না। ইসলাম দ্বারা শাসন ব্যবস্থা পরিচালনাও সম্ভব হবেনা। আধুনিক যুগের আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্য লেন-দেন ও প্রাচীন ফিকাহ এর আলোকে পরিচালনা সম্ভবপর হবে না।

এদেশের আলেম, ওলামা, ইসলাম প্রিয় জনগণ, ইসলামী সংগঠন ও ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলোকে এ সত্য অনুধাবন করতে হবে, এবং তাতেই হবে ইসলামের মঙ্গল। মনে রাখতে হবে ইসলাম বই পুস্তকে আটকে থাকার জন্য আসেনি। আল্লাহ ইসলাম দিয়েছেন জীবনের সর্বক্ষেত্রে সর্বস্থানে ও সর্বযুগে বাস্তবায়ন করার জন্য।

একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটি আরও পরিষ্কার হবে। অতীতে লিখিত হেদায়া, দুররুল মুখতার, রাদ্দুল মুখতার, বাদায়েস সানায়ে, মাবসূত ইত্যাদি গ্রন্থের আলোকে আজকের যুগের আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্য, লেন-দেন, ব্যাংক-বীমা পরিচালনা পরিপূর্ণভাবে সম্ভব হচ্ছিলনা বলেই নতুন করে আলেম সমাজ তথা ফকীহদেরকে এসবের জন্য গবেষণা করে বিশেষত ইসলামী ব্যাংক ও বীমা পরিচালনার জন্য পন্থা ও পদ্ধতি আবিষ্কার করতে হয়েছে। এটাইতো

ইজতিহাদ, এই ইজতিহাদ যদি আলেম সমাজ মেনে নিতে পারেন তাহলে অন্যান্য ক্ষেত্রেও যোগ্য আলেমদের ইজতিহাদ করার অধিকার দিতে বাঁধা থাকবে কেন ?

পরিশেষে বলতে চাই, আমাদের এ বক্তব্য ইনশাআল্লাহ গ্রন্থ প্রণেতা ড. ইউসুফ কারযাভীকে বুঝতে ও মূল্যায়ন করতে এবং তাঁর প্রতি ন্যায় ও সুবিচার করতে সহযোগিতা করবে। সর্ব শেষে পাঠক সমাজের প্রতি আমার অনুরোধ তারা যেন আমাদের ভুলত্রুটিগুলো ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখেন। মহান আল্লাহ পাক আমাদের এ শ্রম কবুল করুন। আমীন ॥

ড. মাহফুজুর রহমান
অধ্যাপক, আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া
তারিখ ঃ ১১-৬-০৭ ইং

সূচী পত্র

ইসলাম ও শিল্পকলা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ভূমিকা

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومَن اتبع هداه

আমি আমার بينات الحل الاسلامى (ইসলামী সমাধানের বিবরণ) নামক গ্রন্থে বলেছি, সম্ভবত শিল্পকলা দ্বারাই সমস্যার "ইসলামী সমাধান" দানের পক্ষে আহবানকারীদের ওপর সর্বাধিক আক্রমন করা হয়ে থাকে। আক্রমনকারীরা বলে, "তোমরা এমন এক জীবনের আদর্শের দিকে ডাকছ যাতে প্রত্যেকের মুখে হাসীর রেখা ফুটানো, যেকোনো অন্তরে অনন্দ অনয়ন, যেকোনো স্থানে সৌন্দর্য বিধান এবং যেকোনো চিত্তে নান্দনিক অনুভূতি জাগরণ হারাম করা হয়ে থাকে।

আমি বলতে চাই, এ অভিযোগের কোনো ভিত্তি আল্লাহ্‌র দ্বীন ইসলামে নেই। শিল্পকলার মূল কথা যদি সৌন্দর্য অনুভব করা ও প্রকাশ করা হয়, তাহলে ইসলাম হলো এমন এক দ্বীন যা প্রত্যেক মুসলমানের অন্তরের অন্তস্থলে সৌন্দর্য প্রেম ও তার অনুভূতি গেড়ে দিয়েছে।

আল-কুরআনের পাঠক মাত্রই এ বাস্তবতা সুস্পষ্ট এবং জোরালো ও গভীরভাবে অনুভব করে থাকেন। কুরআন মুমিনদের কাছে কামনা করে যে, তারা গোটা বিশ্বে বিস্তৃত সৌন্দর্য অবলোকন করুক। তারা দেখুক সেসব অসাধারণ শিল্পকর্ম যা তাদের প্রভু নিজ হাতে সন্দুরভাবে সৃষ্টি করেছেন এবং সবকিছু সুনিপুণভাবে অংকন করেছেন । কুরআন মজিদে বলা হয়েছে ঃ

اَلَّذِیْٓ اَحْسَنَ كُلَّ شَیْءٍ خَلَقَهٗ -

যিনি তাঁর সব সৃষ্টিকে সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন। (সূরা সিজদা ঃ ৭)

مَاتَرٰى فِیْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ -

তোমরা আল্লাহ্‌র সৃষ্টিতে কোনো ব্যবধান দেখতে পাবে না।

(সূরা আল-মুলক ঃ ৩)

صُنْعَ اللّٰهِ الَّذِیْٓ اَتْقَنَ كُلَّ شَیْءٍ -

সে আল্লাহ্‌র কর্ম যিনি সব কিছু সুনিপুণভাবে করেছেন। (সূরা নমল ঃ ৮৮)

আমরা আরো দেখতে পাই যে, আল-কুরআন মহাবিশ্বের বিভিন্ন অংশের বিশেষ সৌন্দর্য অবলোকন করতে দৃষ্টি আকর্ষণ করছে এবং মন ও অন্তরকে স্বচেতন করছে ।

আল-কুরআন এসবের মাধ্যমে মানবীয় অনুভূতিকে জাগ্রত করতে চায়, চায় আল্লাহ্ কর্তৃক আমাদের মধ্যে ও আমাদের ওপরে নীচে ও চতুষ্পার্শ্বের প্রকৃতিতে রক্ষিত সৌন্দর্য যেন আমরা অনুভব করতে পারি। এবং আমাদের চোখ ও অন্তরকে এর প্রভায় উজ্জ্বল এবং গোটা বিশ্বে বিস্তৃত সৌন্দর্য দ্বারা ভরে দিতে পারি।

কোনো কোনো সভ্যতা এ দিকটিকে উপেক্ষা করে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে কোনো পাথর কাগজ ইত্যাদিতে নকল করে নিয়ে যাবার মানবীয় চেষ্টার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে। সেসব সভ্যতা আসমান জমিন সাগর পাহাড় পশু-পাখী ইত্যাদিতে আল্লাহ প্রদত্ত সৌন্দর্যের গোপন যে রহস্য বিদ্যমান তা লক্ষ্য করেনা। তবে তারা তা তখনই লক্ষ্য করে যখন তা কোনো বোর্ড কিংবা রূপায়িত চিত্রে নকল করা হয়।

ইসলাম সৌন্দর্যবোধকে জাগ্রত করে, এবং নান্দনিক শিল্পকলাকে সমর্থন করে। তবে তা কিছু শর্ত সাপেক্ষে। যাতে তা কল্যাণে আসে, ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী না হয়। নির্মাণ করে, বিধ্বংসী না হয়।

ইসলাম বেশ কিছু শিল্পকলা সৃষ্টি করেছে। ইসলামী সভ্যতার ছায়ায় তা সমৃদ্ধ হয়েছে এবং সেসব শিল্প দ্বারা ইসলামী সভ্যতা অন্যান্য সভ্যতা হতে বৈশিষ্ট্য মণ্ডিতও হয়েছে। যেমন মসজিদ, বাড়ি-ঘর, বাসন-কোশন ইত্যাদিতে ক্যালিগ্রাফী শিল্প, কারুকার্য শিল্প, নকসা শিল্প ইত্যাদি।

তেমনিভাবে ইসলাম সাহিত্য শিল্পের প্রতিও সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে, যাতে আরবরা প্রাচীন কালেই বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিল। এবং একে আরো সমৃদ্ধ করেছিল অন্যান্য জাতি হতে অর্জিত সাহিত্য দ্বারা। আল-কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে সাহিত্য শিল্পের শীর্ষচূড়া স্বরূপ। আল-কুরআনের তেলাওয়াত ও শ্রবণ— উভয়ই— যারা বুঝে এবং হৃদয়ঙ্গম করতে পারে তাদের জন্য মন ও আত্মার এমন খোরাক জোগান দেয় যার সমকক্ষ ও সমমানের আর কিছুই হতে পারে না। আর এটা কেবল কুরআনের বিষয়বস্তু ও অভ্যন্তরীণ বিষয়ে সীমাবদ্ধ নয়; বরং তার বাচন শৈলীতেও রয়েছে। এতদসঙ্গে তারতীল, তাজবীদ, তাহযীর তো রয়েছে যা কিনা শ্রুতিমধুর ও হৃদয়গ্রাহী, বিশেষত যখন

কোনো সুললিত কণ্ঠের অধিকারী তেলাওয়াত করেন। একারণেই রাসূল (স) আবু মূসা (রা)-কে বলেছিলেন, "তোমাকে দাঊদ পরিবারের লোকদের ন্যায় সুরেলা কণ্ঠস্বর দেয়া হয়েছে। (বুখারী ও তিরমিযি)

এতে সন্দেহ নেই যে, শিল্পকলা বিষয়টি অতী গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাবশালী। কারণ তা জাতির হৃদয় ও অনুভূতির সাথে সম্প্রিক্ত। শিল্পকলা বিভিন্ন প্রভাবসৃষ্টিকারী উপকারণ দ্বারা– যা শোনা যায়, পড়া যায়, দেখা যায়, অনুভব করা যায়, কিংবা চিন্তা করা যায়– জাতির দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্বাস গঠনে কাজ করে।

এ বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই যে, শিল্পকলাও বিজ্ঞানের মতো। তাকেও বিজ্ঞানের মতো কল্যাণকর কাজে এবং বিনির্মাণে যেমন ব্যবহার করা যায় তেমনি অকল্যাণ ও ধ্বংসের কাজেও ব্যবহার করা যায়। আর এটাই হলো তার প্রভাবশালী হওয়ার মূল কারণ।

আর একারণেও শিল্পকলা গুরুত্বপূর্ণ যে, তা মূলত উদ্দেশ্যের মাধ্যম। কাজেই তার হুকুমও উদ্দেশ্যের হুকুম। হালাল ও বৈধ কাজে ব্যবহৃত হলে তা হালাল, আর যদি হারাম কর্মে ব্যবহৃত হয় তাহলে তা হারাম।

আমি শিল্পকলা সম্বন্ধে ইসলামের অবস্থান প্রসঙ্গে আমার বেশ কয়েকটি বইতে আলোচনা করেছি। আমার "ইসলামের হালাল হারামের বিধান" গ্রন্থে "মুসলমানদের জীবনে আনন্দ-বিনোদন" অনুচ্ছেদে এবং ছবি ও চিত্রাংকন প্রসঙ্গে আলোচনায় এবং আরো কয়েকটি স্থানে আলোচনা করেছি।

এ প্রসঙ্গে আমার 'সমসাময়িক ফতোয়া' গ্রন্থে প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে ছবি, বাদ্যযন্ত্রসহ গান ও বাদ্যযন্ত্রহীন গান, ধর্ম ও হাসা-হাসী, দাবা খেলা ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন ফতোয়াতেও আলোচনা করেছি।

এ প্রসঙ্গে ব্যাপক ভাবে ও সবিস্তারে এ পুস্তিকায় আলোচনা করেছি। এখানে বিভিন্ন রকমের শিল্প মাধ্যম যা শ্রবণীয় ও দর্শনীয়, বিভিন্ন রকমের খেলাধুলা— যা হাসায় ও যা কাঁদায়— সব সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। আর তা এ দৃষ্টিকোণ থেকে যে, তা আমাদের কাঙ্খিত ইসলামী সমাজের সুস্পষ্ট অবয়বের পরিচায়ক। আর এ পুস্তিকায় শিল্পকলা ও খেলাধুলা অনুচ্ছেদটি সমাজের অবয়বের মূল অনুচ্ছেদ।

কোনো কোনো ধর্ম প্রচারক ভাই ও কিছু কিছু চিন্তাশীল বুদ্ধিজীবী আলোচক এ লেখাটি পড়েছেন। তারা একে এ বিষয়ে পরিপূর্ণ, দলিল-প্রমাণে সমৃদ্ধ, দৃষ্টিভঙ্গিতে মৌলিক, বাস্তবে সমসাময়িক পেয়েছেন বলে অভিমত ব্যক্ত

করেছেন। ফলে তারা আমার কাছে একে আলাদা পুস্তিকাকারে প্রকাশ করার আহ্বান জানিয়েছেন, যাতে সকলে এর দ্বারা উপকৃত হতে পারেন। এটা কোনো বড় গ্রন্থের অংশ বিশেষ হলে মানুষ এর দিকে লক্ষ্য নাও করতে পারে। আবার কারো কারো জন্য তা ক্রয় করা দুঃসাধ্যও হতে পারে।

কাজেই তাদের আবেদনে সাড়া দেয়া ছাড়া আমার কোনো গত্যন্তর ছিলনা। পরিশেষে মহান রাব্বুল আলামীনের কাছে কামনা করি, তিনি যেন এর দ্বারা— যারা এ পুস্তিকা পাঠ করেন তাদের কল্যাণ করেন, আর যারা এ পুস্তিকা প্রকাশ ও প্রচার করেছেন তাদের উত্তম প্রতিদান দেন। আমাদের সর্ব শেষ কথা হলো

الحمد لله رب العالمين

কায়রো

রবিউল আউয়াল ঃ ১৪১৬ হিঃ

আগষ্ট ঃ ১৯৯৫ ইং

ইউসুফ আল-করযাভী

খেলা-ধুলা ও শিল্পকলা

বাড়াবাড়ি ও শিথিলতার মধ্যে বাস্তবতার অনুপস্থিতি

সম্ভবত মুসলিম সমাজের সাথে সম্প্রিক্ত সবচেয়ে কঠিন ও সূক্ষ্ম বিষয়টি হচ্ছে খেলা-ধুলা ও শিল্পকলার বিষয়টি। আর তা একারণে যে, অধিকাংশ মানুষ এ ব্যাপারে বাড়াবাড়ি ও শিথিলতায় নিমজ্জিত। এ দৃষ্টিকোণ থেকে যে, তা বুদ্ধি ও চিন্তার চেয়ে হৃদয় ও অনুভূতির সাথে বেশি সম্প্রিক্ত। যেসব বিষয় এ ধরনের হয় তাতে একদিকে গোড়ামী ও বাড়াবাড়ি যেমন হয়ে থাকে, তার মুকাবিলায় অন্য দিকে কঠোর নীতি অবস্থান ও সীমালঙ্গনও হয়ে থাকে।

কেউ কেউ ইসলামী সমাজকে একটা এবাদত বান্দেগী এবং কষ্ট ও পরিশ্রমের সমাজ বলে মনে করে। কাজেই তাদের ধারণা এখানে খেলা-ধুলা, হাসী-ঠাট্টা, আনন্দ-বিনোদনের কোনো স্থান নেই। এ সমাজের কোনো মুখে হাসী ফুটতে পরবেনা। কারো ঠোটে মুচকি হাসীও থাকতে পারবেনা। কারো অন্তরে খুশীর উদয় হতে পারবে না আর না কোনো মানুষের মুখে চাকচিক্যের রেখা অংকিত হতে পারবে।

সম্ভবত এ ধারণা পোষণের ক্ষেত্রে তাদেরকে সহযোগিতা করেছে কোনো কোনো ধার্মিকের আচরণ। যাদেরকে দেখা যায় মুখ বিকৃত, কপাল কুচকানো ও বিষন্নাবস্থায়। কারণ তারা নিরাশ ব্যর্থ, মানসিকভাবে অসুস্থ ও ভারসাম্যহীন। তবে তারা তাদের এ দোষিত আচরণকে ধর্মের নামে দোষমুক্ত করতে চায়। অর্থাৎ তারা তাদের আত্মকেন্দ্রিক ও সন্ত্রস্ত সভাবকে ধর্মের ওপর আরোপ করতে চায়। ধর্মের কোনো অপরাধ নেই। অপরাধ তাদেরই, কারণ তারা ধর্ম সঠিকভাবে বুঝতে পারেনি। তারা ধর্মের কোনো কোনো শিক্ষা গ্রহণ করেছে আর কিছু কিছু শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করেছে।

তারা নিজেরা নিজেদের ওপর কঠোরতা আরোপ করতে পারে যদি তারা তাতে সন্তুষ্ট থাকে। তবে সমস্যা তখনই হয় যখন তারা এই কঠোরতা সমগ্র সমাজের ওপর চাপিয়ে দিতে চায়। এবং তাদের অভিমত গ্রহণে বাধ্য করতে চায়, এমন কোনো বিষয়ে যা সমস্ত গণমানুষের জীবনের সাথে জড়িত।

এদের বিপরীতে আর এক শ্রেণীর মানুষ আছে যারা নিজেদের প্রবৃত্তির লাগাম ছেড়ে দিয়েছে। তারা তাদের গোটা জীবনকে খেল-তামাশায় পরিণত করেছে। তারা বৈধ ও অবৈধ, ফরয ও প্রত্যাখ্যাত, হালাল ও হারামের মধ্যের আড়াল

তুলে দিয়েছে। ফলে দেখা যায় যে, তারা অবক্ষয়ের দিকে ডাকছে। ধর্মহীনতার প্রচলন করছে এবং প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অশ্লীলতার বিকাশ ঘটাচ্ছে। এসবই করছে শিল্পকলা ও বিনোদনের নামে। তারা ভুলে গেছে যে, শরীয়তের হুকুম বিষয়বস্তু ভিত্তিক হয়ে থাকে, নাম ও বহিরাবরণের ওপর হয়না। এবং সব কিছু (হুকুমও) উদ্দেশ্যের ওপর নির্ভর করে।

সুতরাং বিষয়টির প্রতি বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত এবং সুষ্ট দলিলের আলোকে ইসলামী সুবিচারপূর্ণ দৃষ্টিদান আবশ্যক। যাতে শরীয়তের মূল উদ্দেশ্য ও ফিকাহ নির্ধারিত মূলনীতি অনুসারে প্রথমোক্ত মতবাদীদের বাড়াবাড়ি এবং শেষোক্তদের শৈথিল্য থাকবে না।

এখানে এ প্রসঙ্গে আমি সবিস্তারে আলোচনা করতে পারছিনা। কারণ আমি এই একই বিষয় একাধিক গ্রন্থে লিখেছি। বিশেষত "ইসলামে হালাল-হারামের বিধান" ও "সমসাময়িক ফাতোয়া" গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে। বিশেষ করে দ্বিতীয় খণ্ডে।

ইসলামের সমগ্র মানব জাতির সাথে ব্যবহারের বাস্তবসম্মত নীতি গ্রহণ

এখানে যে মৌলিক কথাটি আমি বলতে চাই তা নিম্নোক্ত মূলনীতি সমূহে প্রতিভাত হয়।

ইসলাম একটা বাস্তবসম্মত ধর্ম। এর বিধি-বিধান গোটা মানুষকে তথা তার দেহ, আত্মা, মন-মস্তিষ্ক, ও হৃদয়তন্ত্রীকেও পরিব্যাপ্ত করে, এবং তার কাছে এসবের পুষ্টিবিদান কামনা করে। যাতে এসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যথাযতভাবে নিজের চাহিদা পূরণ করতে পারে। যা কিনা আল্লাহর বান্দাদের বিশেষ গুন। যারা إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا — "যখন দান করে তখন অপব্যয় ও কার্পণ্য করে না এবং এতদুভয়ের মধ্যেই অবস্থান গ্রহণ করে।" (সূরা আল ফুরআন ঃ ৬৭) তাদের এ বিশেষত্ব কেবল সম্পদের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়, বরং সর্ব বিষয়ে এটা তাদের সাধারণ মৌলিক চরিত্র। আর এটাই মধ্য পন্থাবলম্বনকারী উম্মতের মধ্যপন্থা।

ব্যায়াম যদি শরীরের পুষ্টি বিদান করে আর এবাদত-বান্দেগী আত্মার খোরাক যোগায়, জ্ঞান-বিজ্ঞান-বুদ্ধি বাড়ায়, তাহলে শিল্পকলা মন-মানসের পুষ্টি বিধান করে।

এখানে আমরা সে শিল্পকলার কথা বলছি যা মানুষের কল্যাণ সাধন করে, অকল্যাণ করে না।

আল-কুরআনের মহাবিশ্বের সৌন্দর্য ও উপকারিতা উভয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ

শিল্পকলায় আত্মা যদি সৌন্দর্য বোধ ও তার রস আস্বাদন হয়ে থাকে তাহলে এটা হচ্ছে সে জিনিস যার প্রতি আল-কুরআন দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং গুরুত্বরোপে করেছে একাধিক স্থানে। আল-কুরআন জোরাল ভাবে সে সৌন্দর্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে যা আল্লাহ তা'আলা তার সমস্ত সৃষ্টি জগতে বিধান করেছেন, পাশাপাশি তার উপকারিতার প্রতিও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

এতদ্ব্যতীত আল-কুরআন মানুষের জন্য সৌন্দর্য উপভোগ ও তার দ্বারা উপকৃত হওয়াও অনুমোদন করেছেন। আল্লাহ তা'আলা মানব কল্যাণের স্বার্থে চতুস্পদ জন্তু সৃষ্টি প্রসঙ্গে বলেন ঃ

وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ وَّمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ -

চতুষ্পদ জন্তু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন, তাতে তোমাদের জন্য শীত বস্ত্রের উপকরণ আছে। আরো অনেক উপকার রয়েছে, এবং তার কিছু সংখ্যক তোমরা আহার্য হিসেবে গ্রহণ করে থাকো। (সূরা নাহাল ঃ ৫)

এতে উপকার ও কল্যাণের দিকটি আলোচিত হয়েছে। অপর আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَلَكُمْ فِيْهَا جَمَالٌ حِيْنَ تُرِيْحُوْنَ وَحِيْنَ تَسْرَحُوْنَ -

এবং এতে তোমাদের জন্য সৌন্দর্যও রয়েছে যখন তোমরা বিকেলে চারণভূমি থেকে ফিরে আনো এবং সকালে চারণ ভূমিতে নিয়ে যাও। (সূরা নাহাল ঃ ৬)

এখানে সৌন্দর্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে আল্লাহ কর্তৃক সৃষ্ট এই অসাধারণ উজ্জ্বল শিল্পকর্মের প্রতি যাকে সৃষ্টির কোনো শিল্পির হাত অংকিত করেনি। বরং তা স্বয়ং স্রষ্টা নিজ হাতে অংকন করেছেন।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন ঃ

وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيْرَ لِتَرْكَبُوْهَا وَزِيْنَةً -

তোমাদের আরোহরনের জন্য এবং শোভার জন্য তিনি ঘোড়া, খচ্ছর ও গাধা সৃষ্টি করেছেন। (সূরা নাহাল ঃ ৮)

আরোহন একটি বৈষয়িক গুরুত্বপূর্ণ উপকার, আর শোভা হলো একটি শৈল্পিক নান্দনিক উপভোগ্য বিষয়। এর দ্বারা মানুষের সমগ্র প্রয়োজন পরিপূর্ণ আকারে পূরণ হয়।

এ প্রসঙ্গে উক্ত সূরায় আল্লাহ তা'আলা সমুদ্রকে অনুগত করে তার অনুকম্পার ব্যাপারে বলেন ঃ

وَهُوَالَّذِىْ سَخَّرَ الْبَحْرَلِتَاْ كُلُوْامِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَّتَسْتَخْرِ جُوْامِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا -

তিনিই কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন সমুদ্রকে যাতে তা থেকে তোমরা তাজা মাংস খেতে পারো এবং তা থেকে বের করতে পারো পরিধেয় অলংকার।
(সূরা নাহাল ঃ ১৪)

এখানে সমুদ্রের উপকারিতা কেবল বৈষয়িক উপকরণে— যা শরীরের জন্য উপকারী আহার্য তাজা মাংসে প্রতিভাত হয়— সীমাবদ্ধ করা হয়নি। বরং তার সাথে শোভা বর্ধনের জন্য পরিধেয় অলংকারকেও এর সাথে সম্প্রিক্ত করা হয়েছে, যাতে মন ও দর্শন ইন্দ্রিয় তা উপভোগ করতে পারে।

আল-কুরআনে এজাতীয় প্রসঙ্গের অবতারণা একাধিক স্থানে করা হয়েছে। এর মধ্যে পরস্পর মিল ও অমিল, উদ্ভিদ, শস্য, খেজুর, আঙ্গুর, যায়তুন, আনার ইত্যাদির কথা রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা সূরা আন'আমের একস্থানে বলেন ঃ

كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖٓ اِذَآ اَثْمَرَ وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ وَلَاتُسْرِفُوْ -

তোমরা এগুলোর ফল খাও যখন ফল হয়, এবং হক দান করো কর্তনের সময় এবং অপব্যয় করো না। (সূরা আন'আম ঃ ১৪১)

উক্ত সূরার অন্য স্থানে শস্য ক্ষেত খেজুর বাগান ও আঙ্গুর বাগানের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

اُنْظُرُوْٓا اِلٰى ثَمَرِهٖٓ اِذَآ اَثْمَرَ وَيَنْعِهٖ ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكُمْ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُوْنَ -

লক্ষ করো উহার ফলের প্রতি যখন উহা ফলবান হয়, আরও লক্ষ্য করো উহার পরিপক্কতা প্রপ্তির প্রতি। মুমিনদের জন্য এতে অবশ্য নিদর্শন রয়েছে।
(সূরা আন'আম- ৯৯)

ফল-ফলাদি উৎপাদিত হলে তা খাওয়ার যেমন প্রয়োজন আছে শরীরের, তেমনিভাবে মনেরও তা দেখে উপভোগ করার প্রয়োজন রয়েছে। এভাবেই মানুষ তার প্রধান ও প্রথম উদ্দেশ্য উদর পূর্তির ঊর্ধ্বে উঠতে পারে। তেমনিভাবে আল্লাহ পাকের আর একটি বাণী হলো ঃ

يٰبَنِىْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ج اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ

الْمُسْرِفِيْنَ - قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِىْٓ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَالطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ -

হে আদম সন্তানেরা! তোমরা প্রত্যেক এবাদতের সময় সাজসজ্জা পরিধান করে নাও। খাও এবং পান করো এবং অপব্যয় করো না। নিশ্চয় তিনি (আল্লাহ) অপব্যয়কারীকে পছন্দ করেন না। (হে নবী!) আপনি বলুন, আল্লাহ্‌র সৌন্দর্যকে যা তিনি বান্দাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং পবিত্র খাদ্যবস্তু সমূহকে কে হারাম করেছে। (সূরা আরাফ ঃ ৩১-৩২)

সৌন্দর্য গ্রহণ হলো মনের প্রশান্তির জন্য আর পানাহার হলো দেহের প্রয়োজনে। এতদুভয়ই আবশ্যক ও কাম্য।

দ্বিতীয় উক্তি আয়াতে আমরা দুটি বিষয়ের জন্য নিন্দাবাক্য আবর্তিত হতে দেখতে পাই। (এক) 'আল্লাহ্‌র বান্দাদের জন্য সৃষ্ট সৌন্দর্য', (দুই) 'পবিত্র খাদ্যবস্তু'। সাজসজ্জা হলো সৌন্দর্যের প্রতিক যা আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন, সে কল্যাণকর বস্তুর পাশাপশি যা পবিত্র খাদ্যবস্তু দ্বারা বুঝায়। এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো زينة الله বাক্যে যীনাত বা 'সাজসজ্জা' শব্দটিকে আল্লাহর সাথে সম্প্রিক্ত করা হয়েছে। এর মাধ্যমে সৌন্দর্যকে বিশেষ মর্যাদাবান ও কঙ্খিত বিষয়ে পরিণত করা হয়েছে।

এ প্রসঙ্গেই এতদুভয় আয়াতের পূর্বে লেবাস পোশাক প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ

يٰبَنِىٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِىْ سَوْاٰتِكُمْ وَ رِيْشًا ط وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ-

হে বনী আদম! আমি তোমাদের পোশাক অবতীর্ণ করেছি যা তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করে ও সাজসজ্জা হয় এবং বাঁচার (তাকওয়ার) পোশাক, এটা সর্বোত্তম।

আলোচ্য আয়াতে পোশাককে— যা কিনা আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের জন্য তাঁর করুনা হিসেবে অবতীর্ণ করেছেন— বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। বলতে পারি আল্লাহ পোশাকের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এক উদ্দেশ্য হলো, সতর ঢাকা যা سوآتكم অর্থাৎ "যা তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করে" দ্বারা বুঝা গেল। আর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হলো সাজসজ্জা ও সৌন্দর্য গ্রহণ, যা ريشا বা সাজসজ্জা শব্দ থেকে বুঝা গেল। এবং তৃতীয় উদ্দেশ্যটি হলো, গরম ও ঠাণ্ডা থেকে আত্মরক্ষার পোশাক। যা لباس التقوى বা 'বাঁচার পোশাক' বাক্য দ্বারা বুঝা যায়।

মুমিনের জীবন মানুষ ও প্রকৃতির সৌন্দর্য প্রসঙ্গে তিক্ষ্ণ অনুভূতি সম্পন্ন

আল-কুরআনের বাগ-বাগিচায় বিচরণকারী মাত্রই জানেন যে, আল-কুরআন প্রত্যেক মুমিনের হৃদয়ে ও মনে মহাবিশ্বের আনাচে কানাচে, ওপরে-নিচে,

আশে-পাশে, আসমান-জমিনে, গাছ-গাছালী, পশু-পাখী ও মানুষের মধ্যে যে সৌন্দর্য বিস্তৃত তা বপিত করতে চায়।

পাঠক আসমানের সৌন্দর্য প্রসঙ্গে তাতে পড়তে পায় ঃ

اَفَلَمْ يَنْظُرُوْا اِلَى السَّمَاۤءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنٰهَا وَزَيَّنّٰهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوْجٍ -

তারা কি তাদের উপরস্থিত আকাশের পানে দৃষ্টিপাত করে না, আমি কিভাবে তা নির্মাণ করেছি এবং সুশোভিত করেছি ? তাতে কোনো ছিদ্র নেই।
(সূরা ক্বাফ ঃ ৬)

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِى السَّمَاۤءِ بُرُوْجًا وَّزَيَّنّٰهَا لِلنّٰظِرِيْنَ -

আমরা আকাশে গ্রহ-নক্ষত্র সৃষ্টি করেছি এবং তাকে দর্শকদের জন্য সৌন্দর্য মণ্ডিত করেছি। (সূরা আল-হিজর ঃ ১৬)

আর পৃথিবী ও তার গাছ-গাছালীর সৌন্দর্য সম্পর্কে পড়তে পায় ঃ

وَالْاَرْضَ مَدَدْنٰهَا وَاَلْقَيْنَا فِيْهَا رَوَاسِيَ وَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيْجٍ -

আমরা পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছি এবং তাতে স্থাপন করেছি পর্বতমালা এবং তাতে উদ্‌গত করেছি নয়ন প্রীতিকর সবধরনের উদ্ভিদ। (সূরা ক্বাফ ঃ ৭)

وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ السَّمَاۤءِ مَاۤءً ج فَاَنْۢبَتْنَا بِهٖ حَدَاۤئِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ -

এবং তোমাদের জন্য আসমান থেকে বৃষ্টি অবতীর্ণ করেছি, অতপর তার দ্বারা মনোরম উদ্যান সৃষ্টি করেছি। (সূরা নামাল ঃ ৬০)

আর পশু-পাখির সৌন্দর্য সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বে যা আলোচনা করেছি তা পড়তে পায় ঃ

وَلَكُمْ فِيْهَا جَمَالٌ حِيْنَ تُرِيْحُوْنَ وَحِيْنَ تَسْرَحُوْنَ -

এবং তোমরা গোধুলি লগ্নে তাদের চারণ ভূমি হতে নিয়ে আস আবার যখন প্রভাতে তাদের চারণ ভূমিতে নিয়ে যাও তখন তোমরা তাদের সৌন্দর্য উপভোগ করো। (সূরা নাহাল ঃ ৬)

আর মানুষের সৌন্দর্য সম্পর্কে পড়তে পায় ঃ

وَصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ -

এবং তোমাদের রূপদান করেছেন আর তোমাদের রূপদান চমৎকার ভাবে করেছেন। (সূরা তাগাবুন ঃ ৩)

اَلَّذِىْ خَلَقَكَ فَسَوّٰكَ فَعَدَ لَكَ - فِىْٓ اَىِّ صُوْرَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ -

যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছে অতপর তোমাকে সুঠাম করেছেন এবং সামঞ্জস্য করেছেন, যে আকৃতিতে চেয়েছেন তিনি তোমাকে সে আকৃতিতে গঠন করেছেন। (সূরা ইনফিতার ঃ ৭-৮)

মুমিন এ মহাবিশ্বের সব কিছুতে মহান আল্লাহ্‌র অপূর্ব সৃষ্টি শৈলী দেখতে পায়। সব সৃষ্টির রূপ ও সৌন্দর্যে আল্লাহ্‌র সৌন্দর্য ও নৈপূণ্যতা অবলোকন করে, সে তাতে দেখতে পায় ঃ

صُنْعَ اللّٰهِ الَّذِىْٓ اَتْقَنَ كُلَّ شَىْءٍ -

আল্লাহ্‌র সৃষ্টি নৈপূণ্য, যিনি সমস্ত কিছু করেছেন সুষম। (সূরা নামাল ঃ ৮৮)

اَلَّذِىْٓ اَحْسَنَ كُلَّ شَىْءٍ خَلَقَهٗ -

যিনি তার প্রত্যেক সৃষ্টিকে সৃজন করেছেন উত্তমরূপে। (সূরা সিজদা ঃ ৭)

একারণেই মুমিন তার আসেপাশের সব সৃষ্টিতে সুন্দরের অভিব্যক্তি ভালোবাসেন, কারণ তা মূলত আল্লাহ্ তা'আলারই সৌন্দর্যের প্রভাব।

অনুরূপভাবে সে সুন্দরকে ভালোবাসে কারণ 'জামীল' বা সুন্দর আল্লাহ তা'আলা একটি উত্তম নাম ও এক মহান গুনাবলী।

সে সুন্দর ভালোবাসে একারণেও যে, তার প্রভূ স্বয়ং নিজেই সুন্দর ভালো বাসেন। "তিনি সুন্দর তাই সুন্দরকে তিনি ভালোবাসেন।"

আল্লাহ্ নিজে সুন্দর তিনি সুন্দরকে ভালোবাসেন

রাসূল (স) তাঁর সাহাবীদেরকে উপরোক্ত কথা শিখিয়েছেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করেছিল সৌন্দর্য প্রীতি ঈমানের সাথে সাংঘর্ষিক কিংবা সৌন্দর্য প্রেমিক আল্লাহ ও মানুষের কাছে ঘৃনিত অর্থাৎ অহংকারকারীদের আওতাভুক্ত।

ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যার অন্তরে শর্ষে পরিমাণ অহংবোধ আছে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। তখন এক লোক জিজ্ঞাসা করেন, কোনো লোক চায় যে, তার পোশাক-আশাক সুন্দর হোক, তার জুতা সুন্দর হোক, তখন মহানবী (স) বলেন, "আল্লাহ নিজে সুন্দর তিনি সুন্দরকে ভালোবাসেন। অহংকার হলো সত্য গোপন করা আর মানুষকে তুচ্ছজ্ঞান করা।"[১]

আল-কুরআন এক অসাধারণ সৌন্দর্য মণ্ডিত মুজিয়া

আল-কুরআন ইসলামের সবচেয়ে বড় নিদর্শন এবং রাসূল (স)-এর সার্বাধিক উত্তম মুজিযা। আল-কুরআনকে সৌন্দর্য মণ্ডিত মুজিযা গণ্য করা হয়। এতদ্ব্যতিত

১. মুসলিম।

তা একটি বুদ্ধিবৃত্তিক মুজিযাও বটে। গোটা আরব জাতি তার রচনা শৈলী, বর্ণনা কৌশল, বিন্নস্তকরণ প্রক্রিয়া, অনন্য সুর মাধুর্য ও বিস্ময়কর মিউজিক এর সামনে পরাজিত হয়েছে। ফলে কেউ কেউ তাকে যাদু বলেও মন্তব্য করেছে।

আরবী সাহিত্য বিশেষজ্ঞ এবং অলংকার শাস্ত্রবিদগণ আল-কুরআনের ভাষা শৈলী, মুজিয়া ও সৌন্দর্যমণ্ডিত হবার কারণগুলো আবদুল কাদের জুরজানী থেকে আমাদের যুগের রাফেয়ী, সৈয়দ কুতুব, বিনতেশ শাতী পর্যন্ত সবাই আলোচনা করেছেন।

আল-কুরআন তিলাওয়াত কালে নির্ভুল উচ্চারণের সাথে সাথে শ্রুতিমধুর আকর্শনীয় তেলাওয়াতও কাম্য। এতদুদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا। অর্থাৎ আল-কুরআন আবৃত্তি করো ধীরে ধীরে ।[১]

আর রাসূল (স) বলেন, "তোমাদের সুন্দর আবৃত্তির মাধ্যমে আল-কুরআনকে সৌন্দর্য মণ্ডিত করো।[২] অপর এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, সুললিত কণ্ঠস্বর আল-কুরআনের সৌন্দর্য আরও বৃদ্ধি করে।[৩]

রাসূল (স) আরও বলেছেন, যারা সুললিত কণ্ঠে কুরআন তেলাওয়াত করে না তারা আমাদের দলভুক্ত নয়।[৪] সুললিত কণ্ঠে তেলাওয়াত বলতে শুদ্ধ উচ্চারণ বুঝানো হয়েছে। কুরআন নিয়ে তামাশা করার কথা বুঝানো হয়নি।

রাসূল (স) আবু মূসা আশআরীকে বলেছিলেন ঃ "গত রাতে আমি যখন তোমার তেলাওয়াত শুনছিলাম তখন তুমি আমাকে দেখতে পেলে (খুশী হতে), তুমি দাউদ (আ)-এর পরিবারের সুমধুর সুর লাভ করেছ। এ কথা শুনে আবু মূসা বলেন, আমি যদি তা জানতে পারতাম তাহলে আপনার উদ্দেশ্যে আরও সুন্দর করে তেলাওয়াত করতাম।" অর্থাৎ আরও বিশুদ্ধ উচ্চারণে সুমধুর কণ্ঠে মিষ্টি মধুর শব্দে তেলাওয়াত করতাম।

তিনি আরও বলেন, "আল্লাহ তা'আলা কোনো কিছুর জন্য এরূপ অনুমতি দেননি যেরূপ অনুমতি দিয়েছেন নবী করীম (স)-কে সুললিত কণ্ঠে সুমধুর সুরে উচ্চস্বরে কুরআন তেলাওয়াতের।[৫]

---

১. সূরা মুযয়াম্মিল ঃ ৪

২. মুসলিম

৩. প্রথম বর্ণনাটি আহমদ আবু দাউদ নাসায়ী ইবনে মাজাহ, ইবনে হাব্বান দারিমী বর্ণনা করেছেন, আর দ্বিতীয় বর্ণনাটি দারিমী ও হাকেম বর্ণনা করেছেন। তবে সকলেই বারা (রা) থেকে। দেখুন জামুস্‌সাগীর। (৩৫৮০)

৪. বুখারী।

৫. বুখারী, মুসলিম, আহমদ, আবু দাউদ, নাসায়ীতে আবু হুরাইয়া হতে বর্ণিত। দেখুন জামেউর্স সাগীর" (৫৫১২)

আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক আবদুল্লাহ দারাজ একবার তথ্যমন্ত্রণালয়ের এক বৈঠকে তার অবস্থান সম্পর্কে আমাদের বলেছিলেন— যেখানে তিনি একজন সদস্য ছিলেন— বাকি সদস্যরা তখন চাচ্ছিল রেডিও টেলিভিশনের অনুষ্ঠানের শুরু শেষ এবং মাঝে মধ্যে কেবল ধর্মিয় অনুষ্ঠানেই কুরআন তেলাওয়াত সীমাবদ্ধ থাক। তখন তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, আল-কুরআন শুনা কেবল ধর্মের স্বার্থেই প্রয়োজন নয়, কুরআন শুনা একটা শিল্পও, সুর শুনার কাজও বটে যা কুরআনের মধ্যেই রয়েছে এবং যা সুমধুর কণ্ঠের তেলাওয়াতের মধ্যে উপলব্ধি করা যায়।

এ কথাটি সত্য। আল-কুরআন একধারে ধর্ম, সাহিত্য ও শিল্পও বটে। যা কিনা মানব আত্মাকে পরিতৃপ্ত করে, বিবেক-বুদ্ধিকে তুষ্ট করে, হৃদয়কে জাগ্রত করে, আবেগকে উদ্বেলিত করে এবং ভাষাকে মাধুর্য মণ্ডিত করে।

সৌন্দর্যের প্রকাশ

ইসলাম সৌন্দর্য চর্চা, উপভোগ ও সুন্দরকে ভালোবাসতে আহ্বান যেমন জানায় তেমনিভাবে ইসলাম তা চর্চা করতে, উপভোগ করতে এবং তার প্রতি ভালোবাসার কথা ব্যক্ত করার অনুমতিও প্রদান করে।

কথা শিল্প ও সাহিত্য

এ অনুভুতির কথা সর্বাধিক বেশি জানা যায় কথা শিল্প, যাথ ঃ কবিতা, গদ্য সাহিত্য, মাকামাত সাহিত্য, গল্প, মহাকাব্য তথা সমস্ত সাহিত্যের শাখার মাধ্যমে। নবী করীম (স) কবিতা শুনেছেন এবং তার দ্বারা প্রভাবিতও হয়েছিলেন। যেমন কাব বিন যোহাইরের "বানত সূয়াদ" কবিতাটি। এ কবিতায় প্রেমগাথাও রয়েছে যা সকলের জানা। তেমনিভাবে নাবেগাজাদীর কাসীদাও তিনি শুনেছিলেন। এ কবিতা শুনে তিনি তার জন্য দো'আও করেছিলেন। তেমনিভাবে তিনি দাওয়াতী কর্মের প্রয়োজনে কবিতা ব্যবহার করেছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে কাফেরদের অপপ্রচারের জবাবদানের ব্যবস্থাও করেছিলেন কবিতার মাধ্যমে, যেমন তিনি হাসমানকে দাওয়াতের পক্ষে তার কাব্য প্রতিভাকে কাজে লাগাবার কথা বলেছিলেন। আবার কখনও কবিতার ভুয়সী প্রশংসা করেতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন, সর্বাধিক সত্য কথা যা কবি বলেছিলেন, তাহলো লবীদের এ লাইনটি– الا كل شيء ما خلا الله باطل। অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া সব কিছুই বাতিল।

রাসূলের সাহাবীরাও কবিতা আবৃত্তি করেছেন। কবিতার মাধ্যমে আল-কুরআনের আয়াতের ব্যাখ্যাও করেছেন। তাদের মধ্যে অনেকেই কবিতা লিখেছেন এবং তাতে ব্যুৎপত্তিও অর্জন করেন। যেমন হযরত আলী (রা) সম্পর্কে বলা হয়।

অনেক বড় বড় ইমামও কবি ছিলেন। যেমন ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক, ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইদ্রিস শাফেয়ী প্রমুখ।

রাসূল (স) বলেন, কিছু কিছু কবিতা হেকমত বা প্রজ্ঞাপক।[১] তিনি আরও বলেন, কিছু বক্তৃতার যাদুকরী ক্ষমতা আছে।[২] কিছু কিছু বয়ান বা বক্তৃতায় যাদু আছে, আর কিছু কিছু কবিতায় হেকমত বা প্রজ্ঞা আছে।[৩]

উপরোক্ত হাদীসের তাপর্য হলো, কিছু কিছু কবিতা প্রজ্ঞামুক্ত হেকমত থেকে দূরে। যেমন বাতিলের প্রশংসায় লেখা, মিথ্যা অহংকারপূর্ণ কবিতা, সীমাহীন নিন্দা ও ব্যাঙ্গপূর্ণ কবিতা, অশ্লীল প্রেমের কবিতা ইত্যাদি যা ইসলামী মূল্যবোধের ও নৈতিকতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

একারণেই আল-কুরআন ঐসব কবিদের নিন্দা করেছেন যারা অশ্লীল কবিতা রচনা করে এবং ন্যায় নীতির ধার ধারে না। এবং যাদের কবিতা ও কাজের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকেনা। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক বলেন ঃ

وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوٗنَ - اَلَمْ تَرَ اَنَّهُمْ فِىْ كُلِّ وَادٍ يَّهِيْمُوْنَ - وَاَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ مَالَا يَفْعَلُوْنَ - اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ وَذَكَرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّانْتَصَرُوْا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا -

বিভ্রান্ত লোকেরাই কবিদের অনুসরণ করে। তুমি কি দেখনা যে তারা প্রতি ময়দানে উদভ্রান্ত হয়ে ফিরে ? এবং এমন কথা বলে যা তারা করেনা। তবে তাদের কথা ভিন্ন যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে এবং আল্লাহ্‌কে খুব স্মরণ করে এবং নিপীড়িত হওয়ার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে।
(সূরা আশ শু'আরা ঃ ২২৪-২২৭)

অতএব কবিতা ও সাহিত্যের বিশেষভাবে শিল্পের একটা টার্গেট ও উদ্দেশ্য থাকতে হবে, উদভ্রান্ত ও লক্ষ্যহীন হলে চলবেনা। কবিতা হবে দায়বদ্ধ সাহিত্য, হবে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্বলিত, শিল্প হবে সুনির্দিষ্ট টার্গেটপূর্ণ।

সাহিত্য ও কবিতার যে নির্মাণ কৌশল ও রচনা শৈলী তা পরিবর্তন হতে পারে। তার উন্নয়নও গঠতে পারে। অপরের কাছ থেকে উপযোগী শৈলী গ্রহণ করা যেতে পারে। গুরুত্ব ও তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়টি হলো, উদ্দেশ্য লক্ষ্য বিষয়বস্তু ও আলোচ্য বিষয়।

---

১. বুখারী, মুসলিম। ২. বুখারী মালেক, তিরমিযী। ৩. আহমদ ও আবুদাউদ

অতীতেই আরবরা কবিতার এক ধরনের নতুন নির্মাণ শৈলী অবিষ্কার করেছিলেন, যেমন 'মোয়াশ্-শেখাত' ইত্যাদি। একারণেই আধুনিক কবিতার নতুন নির্মাণ শৈলী তথা চন্দমুক্ত আরবী কবিতা গ্রহণ করতে ইসলামে কোনো বাধা নেই।

অনুরূপভাবে আরবরা ইসলামী যুগে সাহিত্যের কিছু নতুন আঙ্গিক আবিষ্কার করেছিলেন। যেমন "মাকামা" সাহিত্য ও কল্পনিক গল্প ইত্যাদি। যা আমরা "রিসালাতুল গুফরান" 'আল্ফ লাইলা ওয়া লাইলা' গ্রন্থে দেখতে পাই। তারা "কালিলা দিমনা" নামক বইটিও আরবীতে অনুবাদ করে। আরও পরে কিছু লোক মহাকাব্যও রচনা করে, .যথা "কিসসাতু আনতারা", "সীরাতে বানী হেলাল" ইত্যাদি।

আমরা এখানে যা জোর দিয়ে বলতে চাই তাহলো বিশুদ্ধ আরবী ভাষার প্রতি গুরুত্ব দান করতে হবে এবং আঞ্চলিক ভাষা প্রচলের মানসিকতা পরিহার কতে হবে। এবং এ ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। কারণ আঞ্চলিক ভাষার প্রচলন কুরআন সুন্নাহ বুঝার পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়াবে। আরব জাতিকে আঞ্চলিকভাবে বিভক্ত করে ফেলবে, যা আরব জাতীয়তাবাদ ও ইসলাম বিরোধীদের কাম্য।

এর বিপরীতে সহজ আরবী ভাষা ব্যবহার করা যেতে পারে যা সকল আরব বুঝবে। যে ভাষা রেডিও টেলিভিশনে সংবাদ পরিবেশিত হবে এবং দৈনন্দিন সংবাদ পত্রে ব্যবহৃত হবে।

তাছাড়া বিশুদ্ধ আরবী ভাষা আরব জাতি ও অপরাপর আরবী জানা মুসলমানদেরকেও পরস্পর নিকটবর্তী করবে। কারণ তারা বিশুদ্ধ আরবীই কেবল জানে। সকলের সাথে কেবল এ ভাষাতেই বুঝা পড়া করতে পারে।

আমাকে অনেক জায়গায় ইসলামী সাহিত্যের বিভিন্ন আঙ্গিক সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যে, সে গুলো শরীয়ত সম্মত কিনা ? যেমন নাটক গল্প ইত্যাদি। এসব আঙ্গিকের লেখক নিজ থেকে কিছু চরিত্র সৃষ্টি করে থাকেন এবং তাদের দিয়ে এমন সব কথা বলানো হয় এবং এমন সব ঘটনা ঘটানো হয় যা আসলে বলাও হয়নি ঘটেও নি। এসব কি শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম ও মিথ্যার অন্তর্ভুক্ত হবে ?

আমার উত্তর ছিল, এসব কথা নিষিদ্ধ মিথ্যার আওতায় পড়েনা, কারণ শ্রোতা ও পাঠক মাত্রই জানেন যে, এ সবের উদ্দেশ্য তাদেরকে বাস্তবে সংগঠিত কোনো ঘটনা সম্বন্ধে অবগত করানো নয়। এসব কথা তো সেসব কথার মতোই যা পশু পাখীর মুখে বলানো হয়। এতো শৈল্পিক রূপায়নের অন্তর্ভুক্ত। এখানে তাদের

মুখদিয়ে সে সব কথাই বলানো হয়েছে যা সাধারণত এরকম অবস্থায় বলা হয়। যেমন আল-কুরআনে সোলাইমান (আ)-এর সামনে পিপড়া এবং হুদহুদের কথার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। নিঃসন্দেহে এতদুভয় প্রাণী আরবী ভাষায় উপরোক্ত কথা বলেনি। আল-কুরআন তারা তাদের ভাষায় ঐ অবস্থায় যা বলেছিল তার সম্ভাব্য অনুবাদ করেছেন।

আমি নিজেই দুটি নাটক লিখেছি। একটি হলো কাব্য নাট্য, যা ইউসুফ (আ)-এর জীবনী কেন্দ্রিক, আর তা লিখেছিলাম আমার প্রথম সাহিত্য জীবনে। তখন আমি একাদশ শ্রেণীর ছাত্র, আমি তখন শাওকীর কাব্য নাটক দ্বারা প্রভাবিত ছিলাম।

আর দ্বিতীয়টি হলো একটা ঐতিহাসিক নাটক, যা সাঈদ ইবনে জোবাইর ও হোজ্জাজ ইবনে ইউসুফের জীবনী কেন্দ্রীক। আমি নাটকটির নামকরণ করেছিলাম "আলেমুন ওয়া ত্বাগীয়া" (এক আলেম ও এক সৈরাচারী)। এ নাটকটি বহু দেশে মঞ্চস্থ হয়েছে। প্রথমটির তুলনায় ব্যাপকভাবে গ্রহণ যোগ্যতাও পেয়েছে। কারণ প্রথমটি ছিল এক নবীর জীবন কেন্দ্রীক। বর্তমান যুগের আলেমদের মধ্যে এ বিষয়ে ঐকমত্য সংগঠিত হয়েছে যে, নবীদের ভূমিকায় অভিনয় করা যাবে না।

নান্দনিক শ্রবণীয় শিল্প (গান ও মিউজিক)

আমাদের পূর্বোক্ত আল-কুরআন ও হাদীসের আলোচনা হতে একথা সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, ইসলাম সুন্দরের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করে থাকে এবং মানুষের সেই ইন্দ্রকে জাগ্রত করতে আগ্রহী যা তাকে বিভিন্নভাবে সৌন্দর্য উপভোগ করতে শেখায়।

কিছু কিছু 'সুন্দর' মানুষের শ্রবণ ইন্দ্রের কাছে ধরা পড়ে, আবার কিছু কিছু তার দর্শন ইন্দ্রের কাছে আর কিছু অপরাপর ইন্দ্রের কাছে। আমরা এখানে 'শ্রবণীয় সৌন্দর্য' সম্পর্কেই আলোচনা করতে চাই, অর্থাৎ গান সম্বন্ধেই কথা বলতে চাই, হোক তা মিউজিক সহকারে বা মিউজিক বিহীন। এখানে আমরা জবাব দিতে চাই সেই বিখ্যাত প্রশ্নের— গান ও মিউজিক সম্বন্ধে ইসলামের হুকুম কি ?

গান ও মিউজিক সম্বন্ধে ইসলামের হুকুম কি ?

এটা এমন একটা প্রশ্ন যা বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে শুনা যায়। এটা এমন এক প্রশ্ন যার জবাব দানে আজকে সমগ্র মুসলিম জাতি দ্বিধাবিভক্ত। তাদের জবাবের দ্বিধাবিভক্তির কারণে তাদের আচার আচরণও বিভিন্ন ধরনের। তাদের মধ্যে কেউ কেউ সব ধরনের গান ও সব ধরনের মিউজিক কান পেতে শুনে একথা বলে যে, তা হালাল জীবনের অপরাপর হালাল বস্তুর মতো, যা আল্লাহ পাক তাঁর বান্দাদের জন্য হালাল করেছেন।

আবার তাদের মধ্যে কেউ কেউ যে কোনো গানের শব্দ পেলে রেডিও বন্ধ করে দেয় কিংবা তার নিজের কান বন্ধ করে নেয়। তারা বলে, গান হলো শয়তানের বাঁশি ও বেহুদা কথা, যা আল্লাহ্‌র যিকির ও নামায থেকে বিরত রাখে, বিশেষত গায়ক যদি হয় কোনো নারী। কারণ তাদের মতে নারীর কণ্ঠস্বর গান ছাড়াই সতরের অন্তর্ভুক্ত, আর যদি তা গানে হয় তাহলে (তা সহজেই অনুমেয়)। তারা তাদের এ অভিমতের পক্ষে আল-কুরআনের কতিপয় আয়াত, কিছু হাদীস ও কিছু আলেমের অভিমত ও উক্তি দ্বারা দলিল দিয়ে থাকেন।

আবার তাদের মধ্যে কেউ কেউ যে কোনো ধরনের মিউজিক প্রত্যাখ্যান করে, এমন কি রেডি ও টেলিভিশনে সংবাদের পূর্বে প্রচারিত মিউজিক পর্যন্ত।

তৃতীয় আর এক দল এতদুভয় দলের মধ্যে দ্বিধা দ্বন্দ্বে ভোগেন। তারা কখনো এক দলের পক্ষে আবার কখনো অন্য দলের পক্ষে অবস্থান নেয়। তারা অবশ্য এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ইসলামের আলেমদের কাছ থেকে একটা মনে প্রশান্তি আনয়ণকারী চূড়ান্ত ফায়সালা কামনা করে। যা মানুষের আবেগ-অনুভূতি ও দৈনন্দিন জীবনের সাথে সম্পৃক্ত। বিশেষত শ্রবণীয় ও দর্শনীয় প্রচার মাধ্যম মানুষের বাড়ি-ঘরে ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায় প্রবেশ করার পর, এবং তার গান ও মিউজিক বাধ্য ও অবাধ্য ভাবে তাদের শ্রবণ ইন্দ্রকে আকর্ষণ করার পর।

বাদ্যযন্ত্র তথা মিউজিকসহ গান ও বাদ্যযন্ত্র ছাড়া গান এমন একটা বিষয় যা নিয়ে ইসলামের আলেমদের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক দীর্ঘ দিন থেকে চলছে। তারা কিছু বিষয়ে ঐকমত্যে উপনীত হয়েছে আবার কিছু বিষয়ে মতদ্বন্দ্বে লিপ্ত রয়েছে।

তারা ঐকমত্যে উপনীত হয়েছে ঐ সব গান হারাম হবার ব্যাপারে যাতে অশ্লীলতা ও ফাসেকী রয়েছে, এবং যা গুনাহের কাজে উদ্বুদ্ধ করে। কারণ গান তো মূলত কথাই— তার মধ্যে যা ভালো তা ভালোই আর যা মন্দ তা মন্দই। যেসব উক্তিতে হারাম কিছু রয়েছে তাও হারাম। অতএব তার সাথে যদি ছন্দ, সূর ও হৃদয়গ্রাহী কিছু থাকে তাহলে তার অবস্থা কিরূপ হবে ? (তা সহজেই অনুমেয়)।

তেমনিভাবে তারা আরও ঐকমত্যে উপনীত হয়েছে পূর্বোক্ত বিষয় মুক্ত গান হালাল হবার ব্যাপারে, যা বাদ্যযন্ত্র মুক্ত স্বভাব সুলভ ভাবে অনুত্তেজিত কারণার্থে গাওয়া হয়ে থাকে। আর তাও বৈধ আনন্দ বিনোদনের স্থানে। যথা বিয়ের অনুষ্ঠানে, কাউকে স্বাগত জানাবার কালে এবং ঈদের দিন ইত্যাদিতে। তবে শর্ত হলো তাও পর পুরুষের সামনে কোনো নারীর কণ্ঠে হওয়া চলবেনা।

এ প্রসঙ্গে কিছু সুস্পষ্ট কুরআন ও হাদীসের বাণী রয়েছে যা আমরা পরে উল্লেখ করব।

এ ছাড়া বাকি গানের ব্যাপারে তারা সুস্পষ্ট মতদ্বন্দ্বে লিপ্ত। তাদের মধ্যে কেউ কেউ সব ধরনের গানকে হালাল বলে— তা বাদ্যযন্ত্র সহ হোক কিংবা বাদ্যযন্ত্র বিহীন হোক। আর কেউ কেউ সব ধরনের গান-বাজনা হারাম ঘোষণা করেছেন— তা বাদ্য-যন্ত্রসহ হোক বা বাদযন্ত্র বিহীনই হোক। এমন কি তা গুনা কবীরা গুনাহ বলেও উল্লেখ করেছেন।

বিষয়টির গুরুত্বের কারণেই এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা আমাদের কর্তব্য বলে মনে করি। এবং বিভিন্ন দিক থেকে এ প্রসঙ্গে আলোচনা

পর্যালোচনা করা আবশ্যক মনে হয়, যাতে মুসলমানরা এর মধ্য হতে হারাম থেকে হালালকে আলাদা করে নিতে পারেন এবং অকাট্য দলিলের অনুসরণ করতে পারেন। তাদেরকে যেন কারো কথার তাকলীদ বা অন্ধ অনুসরণ করতে না হয়। এর মাধ্যমেই তারা সুস্পষ্ট দলিল নির্ভর এ দ্বীনী বিষয়ে অর্ন্তদৃষ্টি সম্পন্ন হতে পারেন।

মূলত সব কিছু হালাল

ইসলামের আলেমগণ এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, মূলত যে কোনো বস্তু হালাল। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

هُوَالَّذِى خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا -

তিনিই তোমাদের জন্য পৃথিবীর সব কিছু সৃষ্টি করেছেন।

(সূরা আল-বাকারা ঃ ২৯)

কাজেই কোনো কিছু সুস্পষ্ট বিশুদ্ধ নাস তথা আল-কুরআন ও সহীহ হাদীস কিংবা নির্ভরযোগ্য প্রমাণীত ইজমা ছাড়া হারাম হতে পারে না। অতএব কোনো নাস (কুরআন-হাদীস) ও ইজমা না থাকলে, অথবা কোনো কিছুকে হারাম ঘোষণা করে কোনো সুস্পষ্ট নাস আছে কিন্তু তা সহীহ না হলে, কিংবা সহীহ কিন্তু সুস্পষ্ট না হলে সে নাস ঐ বস্তু হলাল হবার ব্যাপারে কোনো প্রভাব ফেলবেনা। বস্তুটি বিস্তৃত হালালের গণ্ডিতেই বাকি থাকবে। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّاحَرَّمَ عَلَيْكُمْ اِلَّا مَااضْطُرِرْتُمْ -

তোমাদের জন্য যা হারাম করা হয়েছে তার বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে। কিন্তু সে গুলোও তোমাদের জন্য হালাল যখন তোমরা নিরুপায় হয়ে যাও।

(সূরা আল-আন'আম ঃ ১১৯)

আর রাসূল (স) বলেন, যা আল্লাহ তা'আলা তার কিতাবে হালাল করেছেন তা হালাল আর যা হারাম করেছেন তা হারাম। আর যেসব বিষয়ে নিরবতা অবলম্বন করেছেন তা মাফকৃত। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র মাফকৃত বস্তু গ্রহণ করো। কারণ আল্লাহ তা'আলা কোনো কিছু ভুলে যাননি। অতপর তিনি তেলাওয়াত করেছেন وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا "তোমার প্রভু কোনো কিছু ভুলে যান না।"[১]

১. হাকেম আবুদ দারদা থেকে বর্ণনা করেন এবং তা সহীহ বলে মন্তব্য করেন, হাদীসটি বাযযারও বর্ণনা করেছেন, আর আয়াতটি সূরা মারিয়মের ঃ ৬৪।

তিনি আরও বলেন, আল্লাহ তা'আলা কিছু কাজ ফরয করে দিয়েছেন তোমরা তা তরক করো না। আর কিছু ব্যপারে সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন তোমরা সে সীমা লংঘন করো না। আর তোমাদের প্রতি দয়া পরবশ হয়ে (ভুলে গিয়ে নয়) কিছু ব্যাপারে নিরব থেকেছেন সেসব ব্যাপারে অনুসন্ধান করোনা।[১]

এটাই যদি শরীয়াতে মূলনীতি হয়, তাহলে কোন নাস বা দলিলের ওপর ভিত্তি করে গান হারাম ঘোষণাকারীরা তাদের অভিমত ব্যক্ত করেছেন ? আর গান বৈধ ঘোষণাকারীদেরই বা এ ব্যাপারে অবস্থান কি ? তা জানা অবশ্যক।

গান হারাম ঘোষণাকারীদের দলিল ও তার পর্যালোচনা

ক. গান হারাম ঘোষণাকারীরা ইবনে মাসঊদ ইবনে আব্বাস ও কোনো কোনো তাবেয়ী থেকে বর্ণিত এক বর্ণনার ওপর নির্ভর করেছেন। তারা নিম্নোক্ত আল্লাহ তা'আলার বাণীর ওপর নির্ভর করেই গান হারাম ঘোষণা করেছেন ঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِىْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ق وَّيَتَّخِذَ هَا هُزُوًا ط اُولٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ -

এক শ্রেণীর লোক আছে যারা মানুষকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে গোমরাহ করার উদ্দেশ্যে অবান্তর কথা-বার্তা সংগ্রহ করে অন্ধভাবে এবং তা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে। এদের জন্য রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি। (লোকমান ঃ ৬)

তারা আলোচ্য আয়াতের لَهْوَ الْحَدِيْثِ বা "অবান্তর কথাবার্তা" এর ব্যাখ্যা করেছেন গান বলে।

ইবনে হাযম বলেন, কয়েকটি কারণে এ বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়। এক, রাসূল (স) ছাড়া আর কারো কাথা হুজ্জত বা গ্রহণযোগ্য নয়। দুই. এ ব্যাখ্যাকাররা অপরাপর সাহাবী ও তাবেয়ীদের ব্যাখ্যার বিরোধীতা করেছেন। তিন. স্বয়ং আয়াতের বাক্যাবলীই তাদের এ ব্যাখ্যা ও দলিলকে বাতিল করে। কারণ তাতে রয়েছে, "এক শ্রেণীর মানুষ আছে যারা আল্লাহ্‌র পথ থেকে গোমরাহ করার উদ্দেশ্যে অবান্তর কথা-বার্তা সংগ্রহ করে অন্ধভাবে এবং তা নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করে।" এটা এমন একটা কর্ম নিঃসন্দেহে যারা এরূপ কর্ম করবে তারা কাফের হয়ে যাবে। কারণ তারা আল্লাহ্‌র পথকে ঠাট্টা বিদ্রুপের বস্তু বানিয়েছে।

---

১. দারেকুতনী কর্তৃক আবু সালাবা আল খশনী থেকে বর্ণিত, হাফেয আবু বকর মোসআলী তার আমানী নামক গ্রন্থে আর নববী তার 'আরবাঈনে' হাদীসটি হাসান বলে মন্তব্য করেছেন।

তিনি আরও বলেন, কোনো মানুষ যদি আল-কুরআনও খরীদ করে তার দ্বারা মানুষকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে গোমরাহ করার জন্য এবং তাকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করার জন্য তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে এরূপ কর্মেরই নিন্দা করেছেন। আল্লাহ কখনো যারা 'অবান্তর কথা-বার্তা' আনন্দ বিনোদন এবং মনে প্রশান্তি আনয়নের জন্য খরীদ করে আল্লাহ্‌র পথকে গোমরাহ করার জন্য খরীদ করেনা তাদের নিন্দা করেন নি। অতএব তাদের উপরোক্ত বক্তব্যের সাথে আয়াতের কোনো সম্পর্ক থাকাটাই বাতিল বলে প্রমাণিত হলো। তেমনিভাবে যারা কুরআন তেলাওয়তে ব্যস্ত থেকে কিংবা হাদীস অধ্যায়নে ব্যস্ত থেকে অথবা কথাবার্তায় ব্যস্ত থেকে অথবা গান বাজনা নিয়ে ব্যস্ত থেকে কিংবা অন্য কোনো কাজে ব্যস্ত থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে নামায ছেড়ে দেয়, নামায হতে গাফিল হয়ে পড়ে সেও ফাসিক— আল্লাহ্‌র নাফরমান। আর যে উপরোক্ত কাজে ব্যস্ত হয়ে কোনো ফরয কাজ থেকে গাফেল হয়ে পড়েনা তিনি সৎকর্মশীল।[১]

খ. তারা মুমিনের প্রশংসায় উল্লেখিত আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারাও দলিল দিয়েছেন ঃ

وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ -

আর যখন তারা অনর্থক কথা-বার্থা শুনে তখন তা থেকে বিমুখ হয়ে পড়ে।
(সূরা আল-কাসাস ঃ ৫৫)

তাদের মতে গান لغو যা অনর্থক কথা-বার্তার অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তার থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব।

এ বক্তব্যের জবাবে বলা যায়, এ আয়াতের বাহ্যিক অর্থ হলো এখানে "লাগভ" বা অনর্থক কথা-বার্তা বলতে গালা-গালী ও তিরিস্কার জাতীয় মন্দ কথা বুঝানো হয়েছে। আয়াতের বাকি অংশও তাই প্রমাণ করে, আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ز سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ز لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ -

তারা যখন অবাঞ্ছিত অনর্থক কথা-বার্তা শুনে তখন তা থেকে বিমুখ হয়ে যায় এবং বলে আমাদের জন্য আমাদের কাজ এবং তোমাদের জন্য তোমাদের কাজ। তোমাদের প্রতি সালাম। আমরা অজ্ঞদের সাথে জড়িত হতে চাইনা। (সূরা আল-কাসাস্ ঃ ৫৫)

---

১. ইবনে হাযম, আল মুহাল্লা, (মুনীরিয়া) ৯ পৃ.৬০

মূলত আয়াতটি আল্লাহ্‌র বান্দাদের প্রশংসায় আল্লাহ্ তা'আলার নিম্নোক্ত আয়াতের মতোই ঃ

وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا -

যখন অজ্ঞরা তাদের সম্বোধন করে তখন তারা বলে তোমাদের প্রতি সালাম। (সূরা আল-ফোরকান ঃ ৬৩)

যদি আমরা ধরেই নেই যে, উক্ত আয়াতের 'লাগভ' বা অনর্থক কাথা-বার্তা গানকেও শামিল করে তাহলেও আমরা দেখতে পাই যে, আয়াতটি গান শুনা থেকে বিরত থাকা মুস্তাহাব বা উত্তম ও প্রশংসনীয় কাজ বলে প্রমাণ করে। গান শুনা থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব প্রমাণ করে না।

"লাগভ" শব্দটি "বাতিল" শব্দের মতোই অনর্থক বেফায়দা বুঝায়, আর বেফায়দা কিছু শুনা কখনও হারাম নয়, যতক্ষণ না তার কারণে কোনো হক বিনষ্ট হয়, কিংবা তা কোনো ওয়াজিব কর্ম থেকে বিরত রাখে।

ইবনে জোরাইজ থেকে বর্ণিত যে, তিনি গান শুনা বৈধ মনে করতেন। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, গান কেয়ামত দিবসে আপনার সৎকর্মের অন্তর্ভুক্ত হবে, না কুকর্মের অন্তর্ভুক্ত হবে? তিনি জবাবে বলেন, তা না সৎকর্মের আর না কুকর্মের অন্তর্ভুক্ত হবে, কারণ তাতো অনর্থক বা লাগভ কথার মতোই। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ

আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে তোমাদের (লাগভ) অর্থহীন শপথের জন্য দায়ী করবেন না। (সূরা আল বাকারা ঃ ২২৪, সূরা আল মায়েদা ঃ ৮৯)

ইমাম গাজালী বলেন, যদি আল্লাহ্‌র নামে অর্থহীন শপথ করার কারণে— যাতে দৃঢ় প্রত্যয় ও ইচ্ছা থাকেনা এবং বিরোধিতা করার চিন্তা-ভাবনাও থাকেনা— আল্লাহ তা'আলা দায়ি না করেন তাহলে কি করে ভাবতে পারি যে, কবিতা গাওয়া ও নৃত্যের জন্য দায়ি করবেন।[১]

আমরা বলতে চাই যে, সব গান 'লাগভ' বা অর্থহীন নয়। কাজেই তার হুকুম হবে তার গায়ক ও শ্রোতার নিয়ত অনুযায়ী। সৎ নিয়ত খেলা-ধুলা ও ঠাট্টা-তামাশা কেও এবাদত ও সৎকর্মে পরিণত করে। আর মন্দ নিয়তে যে আমল বাহ্যত এবাদত এবং ভিতরে ভিতরে প্রদর্শন ইচ্ছায় কৃত, তাকে ধ্বংস ও পণ্ড করে দেয়। "আল্লাহ তা'আলা তোমাদের চেহরা-সূরত ও বাহ্য আমলের

১. ইমাম গাযালী, এহইয়াউ উলুমুদ্দিন, (মিসর ঃ দারুশ শা'আব) কিতাবুস সিমা, পৃ. ১১৪৭।

দিকে তাকান না, তিনি তাকান তোমাদের অন্তর ও প্রদর্শনহীন আমলের দিকে"।[১]

আমরা এখানে ইবনে হাযমের 'আল-মুহাল্লায়' উল্লেখিত একটা চমৎকার উক্তি যারা গান নিষেধ করেন তাদের উদ্দেশ্যে উল্লেখ করতে চাই। তিনি বলেন, তারা (গান হারাম হবার পক্ষে দলিল দিতে গিয়ে) বলেন, গান কি হক না নাহক ? তৃতীয় কোনো কিছু হবার তো অবকাশ নেই, কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا الضَّلٰلُ -

হক বা সত্যের পর গোমরাহী ছাড়া তো আর কিছু নেই। (সূরা ইউনুস ঃ ৩২)

এ প্রসঙ্গে আমাদের জবাব হলো (আল্লাহ তাওফিক দান করুন) রাসূল (স) বলেন, আমল নিয়তের ওপর নির্ভরশীল। প্রত্যেকেই তাই পাবে যা সে নিয়ত করে।[২] সুতরাং যে আল্লাহ্র নাফরমানীর উদ্দেশ্যে গান শুনার নিয়ত করে সে ফাসিক। তেমনিভাবে গান ছাড়া বাকি জিনিসগুলোও অনুরূপ। আর যে নিজ মনে প্রশান্তি আনয়নের উদ্দেশ্যে গান শুনে আল্লাহ্র এবাদত বান্দেগীর জন্য নিজেকে শক্তিশালী করতে চায়, এবং সৎকর্ম করার জন্য নিজেকে তৎপর করতে চায় সে আনুগত্যকারী সৎকর্মশীল বলে গণ্য। আর তার এ কার্মও সত্য ও হক। আর যে গান শুনার ক্ষেত্রে কোনো এবাদত বা নাফরমানীর নিয়ত করেনা তার সে গান শুনা হবে অর্থহীন বৈধ কর্ম। যেমন কারো নিজ বাগানে পায়চারী করার কিংবা বাড়ির আঙ্গিনায় চিত্ত বিনোদনের জন্য বসা কিংবা সবুঝ বা হালকা বাদামী বা অন্য কোনো রঙ্গে নিজের কাপড় রাঙানো, কিংবা নিজের হাত-পা লম্বা করে বসা বা গুটানো ইত্যাদির মতোই।[৩]

গ. তারা নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারাও দলিল দেন। 'মুমিনের তিন প্রকারের খেল-তামাশা ছাড়া বাকি সব খেল-তামাশা বাতিল। নিজ স্ত্রীর সাথে খেল-তামাশা, নিজের ঘোড়া প্রশিক্ষণ দান এবং নিজের তীর থেকে তীর নিক্ষেপ।"[৪] গানও এ তিন কর্মের বাইরে একটি কাজ। (সুতরাং তা বৈধ নয়)

---

১. মুসলিম কর্তৃক আবু হুরায়রা হতে বর্ণিত, কিতাবুল বির ওয়াছিলা ওয়াল আদাব, বাব তাহরীমু জুলমিল মুসলিম।

২. বুখারী ও মুসলিমে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত।

৩. ইবনে হাযম, আল মুহাল্লা, খ.৯, পৃ.৬০

৪. হাদীসটি চার সুনানে বর্ণিত। এর সনদে ইজতিরাব বা বিভ্রাট রয়েছে। হাফেয ইরাকী একথা বলেন, এহইয়াউ উলুমুদ্দীনের তাখরীজে।

গান বৈধ মনেকারীরা এর জবাবে বলেন, হাদীসটি দুর্বল। তা সহীহ্ হলেও তার দ্বারা গান হারাম হবার দলিল দেয়া যায় না। কারণ হাদীসের বাতিল শব্দটি

হারাম বুঝায় না। বরং তা অর্থ ও ফায়দাহীন কর্ম বুঝায়। আবুদ দারদা থেকে তার এ উক্তি বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, "আমি নিজেকে কখনো কখনো বাতিল কাজে ব্যস্তকরি যাতে তার মাধ্যমে হক কাজ করার শক্তি পাই।" তাছাড়া হাদীসটির উদ্দেশ্য কেবল ঐ তিনটি কাজকে সীমাবদ্ধ করাও নয়। কারণ মসজিদে নববীতে হাবশীদের নৃত্য প্রদর্শনের প্রতি দৃষ্টি দানের মাধ্যমে আনন্দ উপভোগ, উপরোক্ত কর্ম তিনটির বাইরে যা সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণীত। তাছাড়া বাগানে পার্কে ঘোরা-ফেরা করা, পাখ-পাখালীর কাকলী শুনা অথবা খেলা-ধুলা করা— যার দ্বারা সাধারণত লোকেরা আনন্দ বিনোদন উপভোগ করে থাকে— তার কিছুই কারো জন্য হারাম নয়, যদিও এসব কাজকে বাতিল ও অনর্থক কাজ বলা যায়।

খ. তারা বুখারী কর্তৃক আবু মালেক বা আবু আমের আশআরী থেকে মুআল্লাক সনদে রাসূল (সা) থেকে বর্ণিত হাদীস দ্বারাও দলিল দিয়ে থাকেন। তিনি [রাসূল (স)] সে হাদীসে বলেন, অচিরে আমার উম্মতের মধ্যে এমন কিছু লোক হবে যারা ব্যবিচার, রেশমী পোশাক, মদ ও মাআযিফ" কে হালাল মনে করবে। মাআযিফ শব্দের অর্থ হলো খেলা-ধুলা ও বাদ্যযন্ত্র।

এ হাদীসটি সহী বুখারীতে থাকলেও মুস্তানিদ বা ধারাবাহিক সনদে বর্ণিত নয়; বরং সনদবিহীন মুআল্লাক ভাবে বর্ণিত। এ কারণেই ইবনে হাযম এ হাদীসটি মুনকাতি বা সনদবিহীন হবার কারণে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাছাড়া তিনি আরও বলেন, এ হাদীসের সনদ ও মতন ইজতিরাব তথা বিভ্রাট মুক্ত নয়।

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী হাদীসটি মুত্তাসিল (সনদ যুক্ত) প্রমাণ করার জন্য চেষ্টা করেছেন। কার্যতই তিনি তা নয়টি মুত্তাসিল সনদে বর্ণনা করেছেন। তবে সব সনদেই এমন একজন রাবী আছেন যার সম্পর্কে হাদীসের বিভিন্ন সামালোচকরা নানান কথা বলেছেন। তিনি হলেন হেশাম ইবনে আম্মার।[১] তিনি দামেশকের খতীব, আলিম, মুহাদ্দিস ও কারী ছিলেন। ইবনে মুঈন ও আল আজালী তাকে নির্ভরযোগ্য বলে মন্তব্য করলেও আবু দাউদ তার সম্বন্ধে মন্তব্য করেন যে, তিনি ভিত্তিহীন চল্লিশটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

---

১. ইবনে হাজর তাগলীকুত তালীক খ ৫ পৃ. ১৭-২২ (বায়রুত আলমাকতাবা আল ইসলামী।

আর আবু হাতেম বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তাঁর অবস্থার পরিবর্তন হয়েছিল। তার কাছে যা কিছু দেয়া হয়েছিল তিনি সব কিছু পড়েছিলেন, আর যা কিছু শুনানো হয়েছিল তা সবই গ্রহণ করেছিলেন। ইবনে সাইয়্যারও তার সম্পর্কে এরূপ মন্তব্য করেছেন।

আর ইমাম আহমদ তার সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, তিনি বাউণ্ডলে হালকা স্বভাবের মানুষ। নাসায়ী বলেন, তাকে নিয়ে তেমন সমস্যা নেই। (এ বক্তব্য তাকে নির্ভরযোগ্য প্রমাণ করে না)

হাফেয যাহাবী তার পক্ষাবলম্বন করা সত্ত্বেও বলতে বাধ্য হন যে, তিনি সত্যবাদী, বেশি হাদীস বর্ণনাকারী। তবে তার বর্ণিত এমন কিছু হাদীস আছে যা মুনকার (দুর্বল) পর্যায়ের।[১]

তাঁর সম্বন্ধে আরও মন্তব্য করা হয়েছে যে, তিনি পারিশ্রমিক ছাড়া কোনো হাদীস বর্ণনা করতেন না।

এ ধরনের লোকের হাদীস বিতর্কিত বিষয়ে গ্রহণ করা হয় না। বিশেষত তা যদি হয় এমন বিষয় যাতে সর্বসাধারণ লিপ্ত।

এ হাদীসটি সহীহ হবার ব্যাপারে এসব কথা থাকা সত্ত্বেও এর তাৎপর্য ও অর্থের ব্যাপারেও নানা কথা আছে। 'মাআযিফ' শব্দটির প্রকৃত অর্থ কি সে ব্যাপারেও কোনো ঐকমত্য হয়নি। বলা হয়েছে, তার অর্থ হলো খেলা-ধুলা। এ অর্থটি একটা অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্টবাচক অর্থ। আর কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ হলো ছয় বা আট তারের গোলাকৃতির বাদ্যযন্ত্র বিশেষ।

যদি ধরে নেই যে, তার অর্থ বাদ্যযন্ত্র তাহলেও বুখারীর উক্ত সনদবিহীন হাদীসটির বাক্য সুস্পষ্টভাবে মাআযেফ বা বাদ্যযন্ত্রকে হারাম প্রমাণ করে না। কারণ ইবনে আরাবীর মতে "হালাল জ্ঞান করবে" এর দুটি অর্থ হতে পারে।

এক, তারা বিশ্বাস করবে যে, এসব কর্ম হালাল আর দ্বিতীয় অর্থটি হলো রূপক অর্থাৎ এসব জিনিস তারা ব্যাপকহারে ব্যবহার করবে। কারণ যদি হালাল জ্ঞান করবে এর উদ্দেশ্য হয়, তার প্রকৃত অর্থ, তাহলে তো তারা কাফের হয়ে যাবে, কারণ এজমা মতে নিশ্চিত হারাম কর্মকে যথা মদ, যেনা, ইত্যাদিকে হালাল বলে বিশ্বাস করা তো কুফুরী।

আর যদি আমরা মেনে নিই যে, তা হারাম বুঝায় তাহলে তা থেকে কি বুঝা যায় যে, উক্ত সব কিছু যথা যেনা, রেশম, মদ, বাদ্যযন্ত্র সামগ্রিক ভাবেই হারাম

২. যাহাবী, মীযানুল ইতিদাল, খ. ৪, পৃ. ৩০২ ; ইবনে হাজার, তাহযীবুত তাহযীব, খ. ১১, পৃ ৫১-৫৪।

অথবা প্রত্যেকটি আলাদা আলাদাভাবেই হারাম ? প্রথম অর্থটি সঠিক ও অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য, কারণ হাদীসটি প্রকৃত পক্ষে এমন একদল মানুষের স্বভাব বুঝাবার জন্য ব্যক্ত হয়েছে, যারা লাল রজনিতে মদ্য পান করে মাতাল হয়ে থাকে। নারী, মাদক দ্রব্য, গান-বাজনা, রেশমী পোশাক ও ব্যবিচার ইত্যাদিতে মত্ত থাকে। এ কারণেই ইবনে মাজাহ হাদীসটি আবু মালেক আশআরী থেকে এ ভাষায় বর্ণনা করেন, "আমার উম্মতের মধ্যে কিছু লোক মদ পান করবে। তারা তার অন্য নাম দেবে। তাদের মাথার ওপর বাদ্যযন্ত্র ও গায়িকাদের গান বাজানো হবে। আল্লাহ তা'আলা তাদের নিয়ে পৃথিবী ধ্বংস করবেন। এবং তাদের মধ্য হতে বানর ও শুকুর বানানো হবে।" হাদীসটি ইবনে হাববানও এভাবেই তাঁর সহীহতে আর বুখারী তাঁর তারীখে বর্ণনা করেছেন।

আর যারাই হাদীসটি হেশাম ইবনে আম্মারের সূত্র ছাড়া অন্য সূত্রে বর্ণনা করেছেন তারা তাতে মূলত মদ্য পানের জন্য তিরিস্কারের কথা উল্লেখ করেছেন, আর বাদ্যযন্ত্র তার সম্পুরক হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

ঙ. গান হারাম ঘোষণাকারীরা আয়শা (রা)-এর নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারাও দলিল দিয়ে থাকেন। আল্লাহ তা'আলা গায়িকা দাসীর বেচাকেনা ও তার মূল্য এবং তাকে (গান) শেখানো হারাম ঘোষণা করেছেন।"

এর জবাব হলো ঃ

প্রথমত ঃ হাদীসটি দুবর্ল, এমনকি গায়িকা দাসীর ক্রয়-বিক্রয় সম্বন্ধে যেসব হাদীস বর্ণিত হয়েছে তা সবই দুর্বল।[১]

দ্বিতীয়ত ঃ ইমাম গাযালী বলেন, হাদীসে যে দাসীর কথা বলা হয়েছে তার দ্বারা সেসব দাসীর কথা বুঝানো হয়েছে যারা শুড়িখানায় পুরুষদের গান গেয়ে শুনায়। কোনো পর নারীর ফাসিক-ফাজিরদের যাদের ফিৎনার ভয় আছে গান শুনানো হারাম। আর তারা ফিৎনা দ্বারা নিষিদ্ধ কর্ম বুঝিয়ে থাকেন। এ হাদীস থেকে দাসী কর্তৃক তার মালিককে গান শুনানো হারাম বুঝা যায় না। বরং মালিক ছাড়া অন্য কাউকে শুনানো যদি তাতে ফিৎনার সম্ভাবনা না থাকে তাও হারাম প্রমাণ হয় না। বুখারী মুসলিমে বর্ণিত আয়শা (রা)-এর বাড়িতে দুই দাসীর গান করা সংক্রান্ত হাদীস তাই প্রমাণ করে।[২]

---

১. দেখুন ইবনে হাযমের 'আল মুহাল্লার' গান সম্বন্ধে আলোচনায় এসব হাদীস সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য। খ. ৯, পৃ. ৫৯।

২. গাযালী, এহইয়াউ উলুমুদ্দীন, পৃ. ১১৪৮

তৃতীয়ত ঃ ঐসব গায়িকা দাসীরা ছিল দাস প্রথার একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ। যে দাস প্রথাকে ধীরে ধীরে বিলুপ্ত করার জন্য ইসলাম এসেছিল। ইসলামের এই চিন্তা দর্শনের সাথে ইসলামী সমাজে তাদের বাকি রেখে বেচা-কেনা করা সঙ্গতিশীল ছিল না। কাজেই হাদীসে যদি গায়িকা দাসীদের বেচা-কেনা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে কোনো বাণী এসে থাকে তাহলে তা এজন্য যে, ঘৃণিত দাস প্রথা যেন বিলুপ্ত হয়ে যায়।

চ. তারা আরও দলিল দেয়, নাফে কর্তৃক ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত হাদীস দ্বারা। তাতে বলা হয়েছে, ইবনে ওমর (রা) একবার এক রাখালের বাঁশির শব্দ শুনতে পান, তখন তিনি তার দু'কানে আঙ্গুল দিয়ে রাস্তা পরিবর্তন করে অন্য রাস্তা দিয়ে তার বাহন চালিয়ে যান। তখন তিনি বলছিলেন, নাফে, তুমি (বাঁশির শব্দ) শুনতে পাচ্ছ ? তখন আমি বলেছিলাম, হ্যাঁ। তখন তিনি চলতে ছিলেন। পরিশেষে যখন আমি বললাম, এখন শুনা যাচ্ছে না, তখন তিনি তার দু'কান থেকে আঙ্গুল বের করে নেন এবং বাহন পূর্বের রাস্তায় নিয়ে আসলেন এবং বললেন, "আমি রাসূল (স)-কে এক রাখালের বাঁশির শব্দ শুনে এরূপ করতে দেখেছিলাম।[২]

এ হাদীস সম্পর্কে আবু দাউদ বলেন, হাদীসটি মুনকার বা দুর্বল। এ হাদীসটি সহীহ হলে তা গান হারামকারীদের বিরুদ্ধে দলিল হিসেবে ব্যবহৃত হবে, তাদের পক্ষে নয়। কারণ বাঁশির শব্দ শুনা হারাম হলে রাসূল (স) কখনো ইবনে ওমর (রা)-কে তা শুনতে দিতেন না। আর ইবনে ওমর তা হারাম মনে করলে নাফে'কে তা শুনতে দিতেন না। অবশ্যই নবী করীম (স) এ নিষিদ্ধ কাজ বন্ধ করার আদেশ দিতেন। নবী করীম (স)-এর ইবনে ওমর (রা)-কে তা শুনতে দেয়া থেকে প্রমাণ হয় যে, তা শুনা হালাল।

আর রাসূল (স)-এর তা না শুনার ব্যাপারটি ছিল দুনিয়ার অনেক মুবাহ বা বৈধ কাজ থেকে তাঁর বিরত থাকার মতোই। যেমন তিনি কোনো কিছুর ওপর ঠেক লাগিয়ে পানাহার পরিহার করতেন, তাঁর কাছে দীনার ও দিরহাম রেখে ঘুমাতেন না, ইত্যাদি।

ছ. তারা বিশেষত নারীদের গান হারাম প্রমাণ করার দলিল দিতে গিয়ে সে কথাই বলেন যা জনগণের মধ্যে প্রচারিত আছে যে, নারীর কণ্ঠস্বরও সতরের অন্তর্ভুক্ত। অথচ আল্লাহ্র দ্বীনে নারীর কণ্ঠস্বর সতর প্রমাণ করার কোনো দলিল বা দলিলের মতো কিছু নেই। নারীরা রাসূল (স)-কে বিভিন্ন বিষয়ে সাহাবাদের

---

২. আহমদ আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ।

সামনে নানান প্রশ্ন করতেন। সাহাবারাও উন্মুল মুমিনীনদের কাছে বিভিন্ন ফতোয়া জিজ্ঞাসা করার জন্য যেতেন আর তারাও ফতোয়া দিতেন, তাদের সাথে কথা বলতেন। কিন্তু কেউ কখনও বলেন নি যে, হযরত আয়শা (রা) ও অন্যান্যদের এ কার্ম ছিল পর্দা লংঘন যা অবলম্বন করা ছিল ওয়াজিব। অথচ নবী করীম (স)-এর স্ত্রীদের প্রতি এ ব্যাপারে কড়া নির্দেশ ছিল যা অন্যদের প্রতি ছিল না। আল্লাহ্ তাদের উদ্দেশ্যে বলেন ঃ

وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا -

এবং প্রথামত ন্যায়সঙ্গত কথা বলবে। (সূরা আহযাব ঃ ৩২)

যদি বলা হয় এটা তো সাধারণ কথা-বার্তার প্রসঙ্গে গানের প্রসঙ্গে নয়, তাহলে আমরা বলব বুখারী মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (স) দুই দাসীর গান শুনেছিলেন, তাদেরকে গান করতে নিষেধ করেননি। আবু বকর (রা) তাদেরকে নিষেধ করলে তাকে বলেছিলেন, তাদেরকে গান করতে দাও। ইবনে জাফর ইত্যাদি সাহাবী ও তাবেয়ীরাও গায়িকাদের গান শুনেছেন।

জ. তারা তিরমিযী শরীফে মারফু সনদে আলী (রা) থেকে বর্ণিত একটি হাদীস দ্বারাও দলিল দিয়ে থাকেন। সে হাদীসে আছে, 'আমার উম্মত যখন পনরটি কাজ করবে তখন তাদের ওপর বালা আসতে থাকবে। তার মধ্যে উল্লেখ করেন, "যখন তারা গায়িকা ও বাদ্যযন্ত্র তৈরী করতে থাকবে"। এ হাদীসটি দুর্বল হাদীস বলে সকল মুহাদ্দিসদের ঐকমত্য রয়েছে, সুতরাং দলিল দানের উপযুগী নয়।

মোদ্দা কথা হলো, যে সব নাস দ্বারা গান হারামকারীরা দলিল দিয়েছেন সেগুলো হয়ত সহীহ কিন্তু সুস্পষ্ট নয়। অথবা স্পষ্ট কিন্তু সহীহ নয়। হারাম বলার জন্য রাসূলে করীম (স) থেকে একটি মারফু হাদীসও সহীহ সনদে বর্ণিত হয়নি। তাদের বর্ণিত সব হাদীসকে জাহেরী মালেকী হাম্বলী ও শাফেয়ী মাযহাবের এক দল লোক দুর্বল বলে মন্তব্য করেছেন।

কাযী আবু বকর ইবনেল আরবী তার আল-আহকাম গ্রন্থে বলেন, হারাম বলার মতো কোনো হাদীস সহীহ বলে প্রমাণীত হয়নি। ইমাম গাযালী ও ইবনে নাহাবীও "ওমদা" নামক গ্রন্থে অনুরূপ কথা বলেছেন। ইবনে তাহের তার "আচ্ছিমা" নামক গ্রন্থে বলেন, এর (গানের হাদীসের) একটি বর্ণও সহীহ বলে প্রমাণীত হয়নি।

ইবনে হাযম বলেন, এ প্রসঙ্গে একটি হাদীসও সহীহ্ বলে প্রমাণিত নয়। এর সব কিছুই জাল। আল্লাহ্র কছম, যদি তার সব হাদীস বা একটি হাদীস কিংবা একধিক হাদীসও রাসূলে করীম (স) থেকে নির্ভরযোগ্য রাবীদের বর্ণনা মতে সহীহ্ বলে প্রমাণিত হতো তাহলে আমরা তা গ্রহণ করতে দ্বিধা করতাম না।[১]

যারা গান হালাল মনে করে তাদের দলিল

ওপরে যারা গান-বাজনা হারাম মনে করে তাদের দলিলসমূহ একে একে উপস্থাপন করেছি। ঐসব দলিল কিভাবে একের পর এক অসার প্রমাণিত হয়েছে তাও দেখিয়েছি। তার মধ্যে একটি দলিলও পায়ের ওপর দাঁড়াতে পারেনি। যখন হারাম হবার দলিলগুলো অসার বলে প্রমাণীত হলো তখন গানের হুকুম নিঃসন্দেহে 'সব কিছু মূলত হালাল' এই নীতির ভিত্তিতে হালাল বলে প্রমাণীত হতো, এমন কি হারাম হবার দলিলগুলো একের পর এক অসার প্রমাণ হবার পর আমাদের কাছে তা হালাল হবার পক্ষে একটি নাস বা একটি দলিলও এমন কি না থাকলেও। অথচ আমাদের সাথে আছে ইসলামের সুস্পষ্ট সহীহ অনেকগুলো নাস, ইসলামের সহনশীল স্প্রিট এবং তার সাধারণ নিয়মনীতি। এখানে আমরা তার বিবরণ পেশ করছি।

প্রথমতঃ ইসলামী নাসের (কুরআন সুন্নাহর) আলোকে গান-বাজনা

গান-বাজনা যারা হালাল মনে করে তারা বেশ কিছু সহীহ্ হাদীস দ্বারা দলিল দিয়েছেন। তার একটি হলো, নবী করীম (স)-এর বাড়িতে হযরত আয়শা (রা)-এর ঘরে দুই গায়িকার গান করা এবং আবু বকর (রা) কর্তৃক এ কথা বলে তাদের ধমক দান যে, নবী করীম (স)-এর বাড়িতে শয়তানের স্তুতি গান? প্রসঙ্গে বর্ণিত হাদীস। এ থেকে প্রমাণীত হয় যে, গায়িকা দুজন ছোট ছিলনা যেমনটি কেউ কেউ মনে করেন। কারণ তারা ছোট হলে আবু বকর (রা)-এর তাদেরকে এভাবে জোরে ধমক দেয়ার কথা নয়।

এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, নবী করীম (স) কর্তৃক আবু বকর (রা)-কে নিষেধ করণ ও তার উল্লেখিত কারণটি। সে কারণটি হলো, নবী করীম (স) এর মাধ্যমে ইহুদীদের জানাতে চাচ্ছিলেন যে, আমাদের ধর্মে আনন্দ বিনোদনের সুযোগ আছে। তিনি তাদের আরও জানাতে চান যে, আল্লাহ্ তাকে সহনশীল স্বভাবজাত এক ধর্ম দিয়ে প্রেরণ করেছেন। এ থেকে প্রমাণীত হয়, অন্যের কাছে ইসলামকে উত্তমভাবে উপস্থাপন করা এবং এ দ্বীনের সহনশীলতা ও তার সহজতা প্রকাশ করা ওয়াজিব।

---

১. ইবনে হাযম, আল মুহাল্লা, খঃ ৯, পৃ. ৫৯।

ইমাম বুখারী ও আহমদ হযরত আয়শা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি আনসারী এক লোকের কাছে এক মেয়ের বিয়ে দেন। তখন নবী করীম (স) বলেন, হে আয়শা তাদের কাছে গান করার কি কেউ নেই ? কারণ আনসারীরা তো গান পছন্দ করে।

ইবনে মাজাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, হযরত আয়শা (রা) তাঁর এক আত্মীয় মেয়েকে এক আনসারীর কাছে বিয়ে দিয়েছিলেন। তখন রাসূল (স) এসে বললেন, তোমরা কি মেয়েটিকে কোনো উপহার সামগ্রী দিয়েছ? তারা বললেন, হাঁ, তারপর তিনি বললেন, তার সাথে এমন কাউকে পাঠিয়েছ কি যে গান গাইতে পারে ? আয়শা (রা) বললেন, না। তখন রাসূল (স) বললেন, আনসারীরা এমন এক সম্প্রদায় যারা গান জানে। যদি তার সাতে এমন কাউকে পাঠাতে যে এরূপ গান গাইত -اتناكم اتيناكم فحيانا وحياكم মোরা তোমাদের তরে এসেছি, তোমাদের তরে এসেছি, মোদের প্রতি স্বাগতম তোদের প্রতি স্বাগতম ?

এ হাদীস প্রমাণ করে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও জাতি গোষ্টির প্রথা এবং মেজাজ-মর্জির প্রতি লক্ষ্য রাখা ও তা মূল্যায়ন করা আবশ্যক। কারো নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা ও মেজাজ-মর্জি অন্য সকলের ওপর চাপিয়ে দেয়া ঠিক নয়।

নাসায়ী ও হাকেম আমের ইবনে সাদ থেকে বর্ণনা করেন। শেষোক্ত জন হাদীসটি সহীহ বলে মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, আমি কুরযা ইবনে কাব ও আবু মাসঊদ আনসারীর কাছে একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে গেলাম। সেখানে কয়েকটি যুবতী দাসী গান করছিল। তখন আমি বললাম, রাসূল (স)-এর বদরী সাহাবীদের সামনে এরূপ করা হচ্ছে ? তখন তারা উভয়ে বললেন, তোমার ইচ্ছা হলে আমাদের সাথে বসে গান শুনো আর ইচ্ছা না হলে চলে যাও। কারণ বিয়ে অনুষ্ঠানে গান-বাজনা করার অনুমতি আমাদের জন্য আছে।

ইবনে হাযম তার সনদে ইবনে ছীরীন থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এক লোক মদীনায় কতিপয় দাসী নিয়ে আসলেন, অতপর তিনি তাদের নিয়ে আবদুল্লাহ ইবনে জাফরের কাছে আসলেন এবং তাকে দাসীগুলো দেখালেন। তখন একটি দাসীকে গান করার আদেশ করলে দাসীটি গান করল। তখন ইবনে ওমর (রা) গান শুনছিলেন, অতপর ইবনে জাফর দাসীটি ধর-দাম ঠিক করে কিনে নিলেন। অতপর লোকটি ইবনে ওমরের কাছে আসলেন এবং তাকে বললেন, হে আবু আব্দুর রহমান আমি সাতশত দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করে ঠকেছি। তখন ইবনে ওমর আবদুল্লাহ ইবনে জাফরের আছে আসলেন আর তাকে বললেন,

তিনি (লোকটি) সাতশত দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করে ঠকেছেন। হয় আপনি কিছু দিরহাম তাকে বেশী দিন নাহয় বেচা-কেনা বাতিল করেন। তখন তিনি বললেন, আমি দাসীটিকে তার কাছে ফিরিয়ে দেব।" ইবনে হাযম বলেন, এতো কাজের মধ্যেও ইবনে ওমর গান শুনেছেন এবং একজন গায়িকার বেচা-কেনার মধ্যস্থতাও করেছেন। এ হাদীসের সনদটি সহীহ। ঐ সব বানোয়াট জাল হাদীস নয় এটি।[১]

যারা গান হালাল মনে করে তারা আল্লাহ তা'আলর নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারাও দলিল দিয়ে থাকেন। আল্লাহ বলেন ঃ

وَاِذَا رَاَوْا تِجَارَةً اَوْلَهْوَ ا نْفَضُّوْآ اِلَيْهَا وَتَرَكُوْكَ قَائِمًا ط قُلْ مَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ط وَاللّٰهُ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ -

যখন তারা দেখল ব্যবসা ও ক্রিড়া-কৌতুক তখন তারা তোমাকে দাড়ানো অবস্থায় রেখে সে দিকে ছুটে গেল। বলো আল্লাহ্র নিকট যা আছে তা ক্রিড়া-কৌতুক ও ব্যবসার চেয়ে উত্তম। আল্লাহ উত্তম রিযিক দাতা।

(সূরা জুম'আ ঃ ১১)

আলোচ্য আয়াতে ক্রিড়া-কৌতুক কে ব্যবসার সাথে একাকার করে আলোচনা করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে ব্যবসা একটা হালাল কাজ। এখানে এতদুভয় কাজকে কেবল একারণেই নিন্দা করা হয়েছে যে, সাহাবারা রাসূল করীম (স)-কে খুতবা দান অবস্থায় দাড়িয়ে রেখে বাহিরের ব্যবসায়ী কাফেলার আগমন উপলক্ষে খুশি হয়ে ডোল তবলা বাজানোতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন।

তারা আরও দলিল দিয়ে থাকেন সে সব হাদীস দ্বারা যা কিছু কিছু সাহাবা কার্যতই গান শুনেছিলেন ও গান শুনাকে সমর্থন করেছিলে মর্মে বর্ণিত হয়েছে। আর তারা হলেন এমন এক আদর্শ সম্প্রদায় যাদের অনুকরণ অনুসরণ করলে হেদায়েত পাওয়া যায়।

তারা গান শুনা হালাল হবার পক্ষে সে এজমার কথাও বলে থাকেন যা তা হালাল মর্মে কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন। আমরা সে প্রসঙ্গে পরে আলোচনা করছি।

দ্বিতীয়তঃ ইসলামের মূল স্প্রিট ও মূল নীতিমালার আলোকে গান

ক. গান মূলত এক ধরনের মন তুষ্টকারী দুনিয়ার পবিত্র জিনিস। মানুষের বিবেক তা পছন্দ করে, মানব প্রকৃতি তা আনন্দ দায়ক মনে করে, আর শ্রবণ

---

১. ইবনে হাযম, আল মুহাল্লা, খ. ৯, পৃ. ৬৯

ইন্দ্রিয় তার প্রতি আগ্রহ বোধ করে। গান কানের খোরাক, যেমনিভাবে সুস্বাদু খাবার পাকস্তলির খাদ্য, আর সুন্দর দৃশ্য চোখের নন্দন, আর সুবাস-সুঘ্রাণ নাসিকার উপভোগ্য। পবিত্র ও উপভোগ্য জিনিস ইসলামে কি হারাম না হালাল?

এটা প্রসিদ্ধ যে, আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলের জন্য দুনিয়ার কিছু পবিত্র জিনিস হারাম করে দিয়েছিলেন তাদের অপকর্মের শাস্তি স্বরূপ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন ঃ

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبٰتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَثِيْرًا - وَّأَخْذِهِمُ الرِّبٰوا وَقَدْ نُهُوْا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ -

ইহুদীদের পাপের কারণে এবং আল্লাহ্‌র পথে অধিক পরিমাণে বাঁধা দানে আমি তাদের জন্য হারাম করে দিয়েছি বহু পুত-পবিত্র বস্তু যা তাদের জন্য হালাল ছিল, আর একারণে যে, তারা সুদ গ্রহণ করত, অথচ এ ব্যাপারে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল। এবং এ কারণেও যে, তারা অন্যায়ভাবে অপরের সম্পদ ভোগ করত। (সূরা আন নিসা ঃ ১৬০-১৬১)

আল্লাহ তা'আলা যখন মুহাম্মদকে নবী রূপে পাঠালেন তখন তার রিসালাতের শিরোনাম দেয়া হলো পূর্বের গ্রন্থগুলোতে এভাবে ঃ

يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهٰهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلٰلَ الَّتِيْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ -

তিনি তাদেরকে নির্দেশ দেন সৎকর্মের, বারণ করেন অসৎ কর্ম থেকে। তাদের জন্য যাবতীয় পবিত্র বস্তু হালাল ঘোষণা করেন ও নিষদ্ধ করেন হারাম বস্তুসমূহ। এবং তাদের ওপর থেকে সে বোঝা নামিয়ে দেন এবং বন্দিত্ব অপসারণ করেন যা তাদের ওপর বিদ্যমান ছিল।

(সূরা আল-আরাফ ঃ ১৫৭)

সুতরাং সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ পছন্দ করে এমন কোনো পবিত্র বস্তু ইসলামে হারাম করা হয়নি। আল্লাহ এ উম্মতের প্রতি দয়াপ্রবণ হয়ে— যেহেতু এ দ্বীন চিরস্থায়ী ও সমগ্র মানব জাতির জন্য আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত তাই— সব পবিত্র জিনস হালাল করে দিয়েছেন, এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمْ ط قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ -

তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে তাদের জন্য কি কি হালাল করা হয়েছে ? আপনি বলে দিন তোমাদের জন্য পুত-পবিত্র বস্তুসমূহ হালাল করে দেয়া হয়েছে। (সূরা আল মায়েদা ঃ ৪)

আল্লাহ কোনো মানুষকে এ অধিকার দেননি যে সে নিজের জন্য বা পরের জন্য যেসব পবিত্র জিনিস আল্লাহ তা'আলা রিযিক হিসেবে দিয়েছেন তা হারাম ঘোষণা করবে। এক্ষেত্রে তার নিয়ত শত শুদ্ধ হলেও কিংবা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন কাম্য হলেও। কারণ হারাম করণ কিংবা হালাল করণ একমাত্র আল্লাহ্‌র হক ও অধিকার। এ অধিকার তার কোনো বান্দা প্রয়োগ করতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

قُلْ اَرَءَيْتُمْ مَّآ اَنْزَلَ اللّٰهُ لَكُمْ مِّنْ رِّزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِّنْهُ حَرَامًا وَّحَلٰلًا ط قُلْ اٰللّٰهُ اَذِنَ لَكُمْ اَمْ عَلَى اللّٰهِ تَفْتَرُوْنَ -

বলো, আচ্ছা নিজেই লক্ষ্য করে দেখো যা কিছু আল্লাহ তোমাদের জন্য রিযিক হিসেবে অবতীর্ণ করেছেন তোমরা সেগুলোর মধ্য থেকে কোনটাকে হারাম আর কোনটাকে হালাল সাব্যস্ত করেছ ? বলো তোমাদের কি আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন না কি তোমরা আল্লাহ ওপর মিথ্যা আরোপ করছ ?
(সূরা ইউনুস ঃ ৫৯)

আল্লাহ তা'আলা আল্লাহ কর্তৃক হালাল কৃত পুত-পবিত্র জিনিসকে হারাম করা, এবং হারাম কৃত অপছন্দনীয় জিনিসকে হালাল করা একই ধরনের অপরাধ বলে ঘোষণা করেছেন। উভয় কর্ম আল্লাহ্‌র ক্ষোভ ও গযব নিয়ে আসে, এবং এতদুভয় কর্মের নায়ককে সুস্পষ্ট ক্ষতির গভীর গর্তে ও চরম গোমরাহীতে নিক্ষেপ করে। আল্লাহ তা'আলা জাহেলী যুগের যেসব লোক এ ধরনের অপকর্মে লিপ্ত ছিল তাদের প্রসঙ্গে বলেন ঃ

قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ قَتَلُوْآ اَوْلَادَهُمْ سَفَهًا ۢ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّحَرَّمُوْا مَا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ افْتِرَآءً عَلَى اللّٰهِ ط قَدْ ضَلُّوْا وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ -

যারা নিজ সন্তানদেরকে নির্বুদ্ধিতা বশতঃ কোনো প্রমাণ ছাড়াই হত্যা করেছে এবং আল্লাহ তাদেরকে যেসব রিযিক দিয়েছিলেন সেগুলোকে হারাম করে নিয়ে আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে, নিশ্চয় তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং সুপথগামী হয়নি। (সূরা আল-আনআম ঃ ১৪০)

খ. আমরা চিন্তা করলে দেখতে পাই যে, গানের প্রতি অনুরাগ ও আকর্ষণ এবং মিষ্টি সুরের প্রতি মোহ মানুষের স্বভাবজাত ও মজ্জাগত ব্যাপার। এমন কি দোলনায় ক্রন্দনরত শিশুর কান্না পর্যন্ত থামিয়ে দেয় সুরেলা গান। এ কারণেই যুগ যুগ থেকে মায়েরা-আয়ারা শিশু লালনকারী নার্সরা গান করে শিশুদের ঘুম পাড়ায়, বরং বলা যায় পশু-পাখীরা পর্যন্ত সুমিষ্ট সুরের মূর্ছনায় সুললিত গানের দ্বারা প্রভাবিত হয়। একারণেই ইমাম গাযালী তার "এহইয়াউ উলুমুদ্দিন" গ্রন্থে বলেন, যাকে গান প্রভাবিত করেনা সে অস্বাভাবিক ও ক্রুটিপূর্ণ আত্মাহীন, সৌন্দর্য বোধহীন এবং পশু-পাখী ইত্যাদির প্রতি মায়া-দয়াহীন এক প্রাণী। এমনকি উটকেও— একটা গর্দব স্বভাবের প্রাণী হওয়া সত্ত্বেও— চালকের গান এমনভাবে প্রভাবিত করে যে, সে গানের ও সুরের মুর্ছনায় ভারী বোঝাকে হালকা এবং দূরের কঠিন পথকে সহজ ও সংক্ষিপ্ত ভাবতে থাকে। এ সুর তার মধ্যে এক প্রকারের নেশা ও মাতলামী নিয়ে আসে। দেখা যায়, সে গান শুনতে পেলে তার গলা বাড়িয়ে দেয়, তার কান দুটি সজাগ করে দেয়, এবং দ্রুত চলতে আরম্ভ করে, ফলে তার পিঠের ভার ও বোঝা নড়া চাড়া করতে থাকে।[১]

গানের প্রতি অনুরাগ যদি একটা স্বভাবগত ও মজ্জাগত ব্যাপার হয়ে থাকে তাহলে কি এ দ্বীন মানুষের স্বভাব ও মজ্জাগত ব্যাপারের বিরুদ্ধাচরণ ও প্রত্যাখ্যান করতে এসেছে ? না কখনো নয়, বরং দ্বীন এসেছে তাকে সুশৃংখল সুবিন্নস্ত করতে এবং তাকে যথাযথ দিক-নির্দেশনা দিতে। ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেন, নবীগণ মানুষের স্বভাব ও ফিৎরাতকে পূর্ণতা দান করতে ও সুবিন্নস্ত করতে এসেছেন, তাকে পরিবর্তন ও বিকৃত করতে আসেননি।

এর সত্যতার প্রমাণ হলো, মহানবী (স) যখন হিজরত করে মদীনায় আসলেন তখন মদীনাবাসীরা দুটি দিন উৎসব হিসেবে পালন করত। তখন তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, এ দিন দুটি কিসের ? তারা জবাবে বলল, আমরা এ দুদিন জাহিলী যুগ থেকে খেলা-ধুলার মাধ্যমে পালন করে আসছি। তখন মহানবী (স) বললেন, আল্লাহ তা'আলা এ দুই দিনের পরিবর্তে তোমাদেরকে আরও উত্তম দুটি দিন উপহার দিয়েছেন, ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরের দিন।[২]

আয়শা (রা) বলে, আমি মহানবী (স)-কে দেখলাম তিনি আমাকে তার চাদর দ্বারা ঢেকে রাখছেন। আর তখন আমি মসজিদে খেলা-ধুলায় রত হাবশীদের খেলা দেখছিলাম। আমি খেলা দেখে পরিতৃপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তিনি

---

১. গাযালী, এহইয়াউ উলুমুদ্দিন।

২. আহমদ, আবুদাউদ, নাসায়ী।

আমাকে ঢেকে রাখলেন। এক্ষেত্রে মহানবী (স) খেলা-ধুলার প্রতি আসক্ত এক তরুণীর আগ্রহের যথাযত মূল্যায়ন করেছেন।

গান যদি হয় খেলা-ধুলার অন্তর্ভুক্ত তাহলে খেলা-ধুলা তো হারাম নয়। আর মানুষতো সর্বদা গম্ভির ও বিনোদন বিহীন থাকতে পারে না।

হযরত হানযালা (রা) যখন মনে করলেন যে, তিনি বউ-বাচ্চা নিয়ে আনন্দ-বিনোদন করার কারণে, এবং (তার নিজের) রাসূলের সামনে থাকাবস্থার ও নিজের বাড়িতে থাকাবস্থার মধ্যে বৈপরিত্তের কারণে মুনাফিক হয়ে গেছেন, তখন মহানবী (স) তাকে বললেন, হানযালা সময় সময় এরূপ করা যায়।[১]

আলী ইবনে আবু তালিব (রা) বলেন, তোমরা তোমাদের মনকে কিছুক্ষণ পরপর সান্তনা দাও। কারণ মনকে বাধ্য করা হলে তা অন্ধ হয়ে যায়। তিনি আরও বলেন, মানুষের শরীর যেমন কাহিল হয়ে পড়ে তেমনি মনও অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। সুতরাং তাকে উজ্জীবিত করার কৌশল অনুসন্ধান করো। আর আবুদদারদা (রা) বলেন, আমি খেলা-ধুলার মাধ্যমে আমার নিজের মনকে কখনো কখনো পরিতৃপ্ত করি, যাতে এর দ্বারা সত্য ও হক কাজ করতে শক্তি পাই।

যারা বলেন, গান হলো খেলা-ধুলা ইমাম গাযালী তাদের জবাবে বলেন, তা অবশ্যই তাই। আর গোটা দুনিয়াটাই তো খেলা-ধুলা। নারীদের সাথে সব ধরনের খুনসুটিওতো খেলা-ধুলাই। তবে সন্তান লাভের কারণ যে কর্ষণ তা কিন্তু এরূপ নয়। তেমনিভাবে অশ্লীতা বিহীন ক্রিড়া-কৌতুকও হালাল। রাসূল (স) স্বয়ং নিজে এবং তাঁর সাহাবীরাও তাই করেছেন বলে বর্ণিত আছে।

হাবশীদের খেলা-ধুলার চেয়ে বেশি ক্রিড়া-কৌতুক আর কোথায় আছে। তাও হাদীস দ্বারা হালাল প্রমাণিত হয়েছে। তাই আমি বলতে চাই ক্রিড়া-কৌতুক অন্তরকে পরিতৃপ্ত করে এবং চিন্তা মুক্ত করে। আর যখন মনকে বাধ্য করা হয় তখন তা অন্ধ হয়ে পড়ে। আর তাকে তৃপ্ত করা হলো কর্মশীল করার জন্য তৈরী করা। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, সর্বদা দ্বীনি শিক্ষায় নিয়োজিত থাকলে জুমার দিনের এবাদত-বন্দেগীতে ব্যঘাত সৃষ্টি হতে পারে। কারণ একদিনের ছুটি বা বিরতি বাকি সব দিনগুলোতে কর্ম তৎপরতা বৃদ্ধিতে সহযোগিতা করে, আর সব সময় নফল নামাযে ব্যস্ত থাকলে কোনো কোনো সময় ফরয ছুটে যাবার সম্ভাবনা থাকে। এ কারনেই কিছু কিছু সময় নামায আদায় নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। কারণ কিছু সময়ের বিরতি কর্মতৎপতা বৃদ্ধির সাহায়ক, আর আনন্দ-বিনোদন

১. মুসলিম।

কর্মশীল করতে সাহায্য করে। (সাধারণ মানুষ) এক নাগাড়ে কর্মব্যস্ত ও কঠোর সৎকর্মে ব্যস্ত সাধনায় লিপ্ত থাকতে পারে না। কেবল নবী-রাসূলরাই তাতে ব্যস্ত থাকতে পারেন।

অতএব আনন্দ-বিনোদন হলো হৃদয়-মনের অলসতা ও জড়তা কাটিয়ে ওঠার মহৌষধ। সুতরাং তা বৈধ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু তা অতিরঞ্জিত হওয়া উচিত নয়। যেমন ঔষধের ব্যবহার বেশি হওয়া উচিত নয়। কাজেই এ নিয়তে আনন্দ-বিনোদনে লিপ্ত হওয়াও এবাদত। এতো সে লোকের ক্ষেত্রে যে লোকের অন্তরে গান শুনলে কোনো ভালো ইচ্ছার উদ্রেক হয়না বরং সে গানের মাধ্যমে কেবল আনন্দ উচ্ছ্বাস উপভোগ করতে চায়। গান শুনা তার জন্য মুস্তাহাব হওয়া উচিত। যাতে সে এর মাধ্যমে পূর্বে উল্লেখিত উদ্দেশ্যে উপনীত হতে পারে। হ্যাঁ এটা কামিল বা শীর্ষ চূড়ায় উপনীতদের বেলায় ত্রুটি প্রমাণ করে। কারণ কমিল লোকদের তো অসত্য দ্বারা মনে প্রশান্তি আনয়নের প্রয়োজন হয় না। তবে দুর্জনের উত্তম কর্মও যে স্বজনের বেলায় কুকর্মের সমতুল্য। আর যারা অন্তরের চিকিৎসা সম্বন্ধে এবং তাকে শান্ত করার উপায় সম্পর্কে আর যারা তাকে সত্য পথে পরিচালিত করার ব্যাপারে অবগত, তারা অবশ্যই একথাও জানেন যে, এসব বিষয় মনে প্রশান্তি আনায়নের এমন এক মহৌষধ যার কোনো বিকল্প নেই।[১] ইমাম গাযালীর উপরোক্ত বক্তব্য অতী মূল্যবান যা তার সত্যিকারের ইসলামের মূল স্প্রিট অনুধাবনের প্রমাণ বহন করে।

যারা গান বৈধ মনে করে

এতো গেল কুরআন হাদীস ও ইসলামের মূলনীতির আলোকে গান হালাল ও বৈধ হবার দলিল সমূহ। এসব দলিল তা বৈধ হাবার জন্য যথেষ্ট। এমন কি কেউ তা বৈধ না বললেও। কোনো ফকীহ তা বৈধ বলে অভিমত না দিলেও। অথচ তা বৈধ হবার পক্ষে অভিমত দিয়েছেন অনেক সাহাবী তাবেয়ী তবেতাবেয়ী ও ফকীহ।

মদীনাবাসীরা— তাদের তাকওয়া পরহেযগারী সত্ত্বেও আর যাহেরী মাযহাবের অনুসারীরা— তাদের কুরআন হাদীসের বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ সত্ত্বেও, আর সুফী মতবাদীরা— কঠোর নীতি অবলম্বন এবং ধর্মের রূখসাত বাদ দিয়ে আজিমত গ্রহণ করা সত্ত্বেও তারা সকলেই গান হালাল মনে করতেন বলে বর্ণিত আছে।

ইমাম শাওকানী তার 'নাইলুল আউতার' গ্রন্থে বলেন, মদীনাবাসীরা এবং তাদের সাথে যাহেরী মাযহাবের অনসারী এবং সুফীবাদীরা গান বৈধ হবার পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেছেন, এমন কি সাথে বীনা থাকলেও।

---

১. এহইয়াউ উলুমুদ্দিন, পৃ. ১১৫২-১১৫৩।

ওস্তাদ আবু মানসুর বাগদাদী শাফেয়ী গান শুনা সংক্রান্ত তার এক গ্রন্থে বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে জাফর গান শুনার ব্যাপারে কোনো বাঁধা আছে বলে মনে করতেন না। তিনি তার দাসীদেরকে গানের সুর তোলার অনুমতি দিতেন। এবং তাদের বাজনাসহ গান শুনতেন। আর এঘটনা ছিল আলী (রা)-এর খেলাফত কালে।

উক্ত ওস্তাদ কাযী শোরাইহ সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব, আতা ইবনে রাবাহ যুহরী ও শাবী থেকেও অনুরূপ গান শোনার কথা বর্ণনা করেছেন।

ইমামুল হারমাইন 'আন্নিহায়া' নামক গ্রন্থে ইবনে আবুদ দুনিয়া বলেন, ঐতিহাসিকরা গান শুনার পক্ষের কথা নকল করেছেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে জোবায়েরের সেতার বাজাতে পারত এমন কয়েকজন দাসী ছিল। একবার আবদুল্লাহ ইবনে উমর তার কাছে গেলেন তখন তার পাশে একটা সেতার ছিল। তখন তিনি বললেন, হে রাসূলের সাথী! আপনার পাশে এটা কি ? তখন তিনি তা হাতে নিলেন এমতাবস্থায় ইবনে উমর তাকে দেখছিলেন, তখন তিনি বললেন, এটা হলো শাম দেশের একটা পাল্লা। ইবনে জোবায়ের বলেন এ দ্বারা জ্ঞানের পরিধি মাপা হয়।

হাফেজ আবু মুহাম্মদ ইবনে হাযম তার গান সংক্রান্ত এক পুস্তিকায় তার নিজের সনদে ইবনে শীরীন থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, এক লোক কিছু দাসী নিয়ে মদীনায় আসলেন (বিক্রির জন্য), লোকটি ইবনে উমরের বাড়িতে মেহমান হলেন। দাসীদের মধ্যে একটা দাসী বাজনা বাজিয়ে গান গাইতে পারত। তখন এক লোক এসে তার সাথে দরদাম করল কিন্তু তার পছন্দ হলোনা। তখন ইবনে উমর বললেন, তুমি এদের নিয়ে এমন এক লোকের কাছে যাও যে লোকটি এ লোকের চেয়ে তোমার জন্য বেশি আদর্শবান হবে। তিনি বললেন, লোকটি কে ? তিনি বললেন, সে লোকটি হলো আবদুল্লাহ ইবনে জাফর। তখন লোকটি দাসীগুলো তার কাছে নিয়ে গেলেন। তখন তিনি তাদের মধ্যে এক দাসীকে আদেশ করে বললেন, যাও 'বীনা' নিয়ে গান শুরু করো। তখন সে গান গাইতে আরম্ভ করল। অতপর দাসীটি তার কাছে বিক্রি করে ইবনে উমরের কাছে ফিরে আসলেন এবং ঘটনাটি পুরাপুরি বর্ণনা করলেন।

'ইকদুল ফরীদের' লেখক সাহিত্যিক আল্লামা আবু আমর স্পেনী বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমর ইবনে জাফরের কাছে একবার গেলে সেখানে এক দাসীকে দেখতে পেলেন যার কোলে একটি বীণা ছিল। তখন তিনি ইবনে উমরকে জিজ্ঞাসা করলেন, এতে কি আপনি কোনো সমস্যা দেখতে পাচ্ছেন ? তিনি জবাবে বললেন, না এতে কোনো সমস্যা নেই।

মাওয়ার্দি মুয়াবিয়া ও আমর ইবনে আস থেকে বর্ণনা করেন যে, তারা উভয়ে ইবনে জাফরের কাছে বীণা শুনেছিলেন।

আবুল ফরজ ইসফাহানী বর্ণনা করেন যে, হাসসান ইবনে সাবেত তাঁর একটি কবিতাকে গিটার দ্বারা গানের সুর দিয়ে গাইতে আজ্জা আল মিলার কাছ থেকে শুনছিলেন।

আবুল আব্বাস আল মুবাররদও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন ।

আদফাবী উল্লেখ করেছেন যে, উমর ইবনে আবদুল আজিজ খেলাফত লাভের পূর্বে তার দাসীদের গান শুনতেন। ইবনে সামআনী তাউস তার অনুমতি দিতেন বলে বর্ণনা করেছেন। আর ইবনে কোতাইবা ও 'আল ইমতা' গ্রন্থের লেখক উভয়ে মদীনার তাবেয়ী কাযী সাদ ইবনে ইব্রাহীম ইবনে আবদুর রহমান যুহুরী থেকে গান শুনার অনুমতি আছে বলে বর্ণনা করেছেন। আর আবু ইয়ালা আল খলিলী তার 'ইরশাদ' নামক গ্রন্থে এ অনুমতির কথা মদীনার মুফতী আবদুল আজিজ ইবনে সালামা মাজেশুন থেকে বর্ণনা করেছেন।

রোয়ানী কাফালের সূত্রে বর্ণনা করেন যে, মালেক ইবনে আনাসের মাযহাব মতে মাআযিফ বীণা সহকারে গান শুনা বৈধ। আর উস্তাদ আবু মানসুর ফাউরানী ইমাম মালেক থেকে বীণা সহকারে গান শুনা বৈধ বর্ণনা করেছেন। আর আবু তালিব মক্কী তার 'কুতুল কলুব' নামক গ্রন্থে শোবা থেকে বর্ণনা করেন যে, বিখ্যাত মুহাদ্দিস মিনহাল ইবনে আমরের বাড়িতে তানপুরা সহকারে গান শুনেছেন।

আবুল ফযল ইবনে যাহের তার গান সংক্রান্ত এক গ্রন্থে বর্ণনা করেন যে, মদীনাবাসীদের মধ্যে বীণা সহকারে গান শুনা বৈধ হবার ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই।

ইবনে নাহাবী তার 'আল ওমদা' নামক গ্রন্থে বলেন, ইবনে তাহের বলেছেন, এ বিষয়ে (গান হালাল হবার বিষয়ে) মদীনাবাসীদের ইজমা হয়েছে। ইবনে তাহের বলেন, সমস্ত যাহেরী মতবাদীরাও এ অভিমত গ্রহণ করেছেন। আদফাবী বলেন, পূর্বোক্ত সাদ ইবনে ইবরাহীম থেকে গান বৈধ হওয়া সংক্রান্ত অভিমত বর্ণনার ব্যাপারে কোনো বর্ণনাকারী দ্বিমত পোশন করেন নি। তার হাদীস সকল মুহাদ্দিস বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ সিহাহ সিত্তাহ তথা বুখারী মুসলিম ও সকল সুনানে বর্ণিত হয়েছে।

মাওয়ার্দি বীণা হালাল হবার কথা কোনো কোনো শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারীদের থেকে বর্ণনা করেছেন। আর তা আবুল ফযল ইবনে তাহের

ইসহাক ইবনে সিরাজী থেকে, আর আসনাবী তার “মুহিম্মাত” গ্রন্থে রোইয়ানী ও মাওয়ার্দি থেকে, আর ইবনে নাহাবী উস্তাদ আবু মানসুর থেকে, আর ইবনেল মুলকান “ওমদা' গ্রন্থে ইবনে যাহের থেকে, আর আদফাবী শেখ আযযুদ্দিন ইবনে আবদুস সালাম থেকে, আর ‘ইমতা' গ্রন্থের লেখক আবু বকর ইবনে আরাবী থেকে বর্ণনা করেছেন। আদফাবী বৈধ হওয়া সম্বন্ধে প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন।

এরা সকলেই কোনো কোনো প্রসিদ্ধ বাজনার সাথে গান শুনা হালাল বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

আর বাদ্যযন্ত্র ছাড়া গান শুনা সম্পর্কে আদফাবী ‘আল ইমতা' নামক গ্রন্থে বলেন, ইমাম গাযালী তার এক ফিকাহ্ গ্রন্থে তা হালাল হবার পক্ষে ফকিহদের ঐকমত্য নকল করেছেন। আর ইবনে তাহের এ ব্যাপারে সাহাবী ও তাবেয়ীদের ইজমা সংগঠিত হয়েছে বলে দাবি করেন। আর তাজ আল ফাজারী ও ইবনে কোতাইবা এ ব্যাপারে হেরমাইন বাসীদের ইজমা আছে বলে মন্তব্য করেন। মাওয়ার্দি বলেন, হেজাযের আদিবাসীরা বছরের সেরা দিনগুলোতে— যাতে কিনা এবাদত-বান্দেগী ও যিকির-আযকার করার আদেশ আছে— গান-বাজনা করার অনুমতি দেন।

ইবনে নাহাবী ‘আল-উমদা' নামক গ্রন্থে বলেন, একদল সাহাবী ও তাবেয়ী গান শুনেছেন ও গেয়েছেন বলে বর্ণিত আছে। সাহাবীদের মধ্যে উমর (রা)-এর ব্যাপারে ইবনে আবদুল বার ইত্যাদি বলেছেন ওসমান (রা)-এর ব্যাপারে মাওয়ার্দি, “আল-বায়ানের” লেখক ও রাফেয়ী বলেছেন। আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা)-এর ব্যাপারে ইবনে আবু শাইবা বর্ণনা করেছেন, ও আবু ওবাইদা ইবনে জাররাহ (রা)-এর ব্যাপারে বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, ও সাদ ইবনে আবু ওয়াককাস (রা)-এর ব্যাপারে ইবনে কোতাইবা বলেছেন, এবং আবু মাসউদ আনসারী (রা)-এর ব্যাপারে বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, বেলাল, আবদুল্লাহ ইবনে আরকাম ও উসামা ইবনে যাইদ (রা)-এর ব্যাপারে বাইহাকী বর্ণনা করেছেন হামযা (রা)-এর ব্যাপারে সহীহতে বর্ণিত হয়েছে। ও ইবনে ওমর (রা)-এর ব্যাপারে ইবনে জাফর ও ইবনে আবদুল বার বর্ণনা করেছেন। ও আবদুল্লাহ ইবনে জোবাইর (রা)-এর ব্যাপারে নকল করেছেন আবু তালিব আল মক্কী। ও হাসসান (রা)-এর ব্যাপারে বর্ণনা করেছেন আবুল ফরজ আল ইস্পাহানী, ও আবদুল্লাহ ইবনে আমর- এর ব্যাপারে বর্ণনা করেছেন জোবাইর ইবনে বাককার। ও কারযা ইবনে কাব (রা)-এর ব্যাপারে বর্ণনা করেছেন আল আগানীর লেখক। ও মুগীরা ইবনে শোবা (রা)-এর ব্যাপারে বর্ণনা করেছেন আবু তালিব আল মাক্কী ও আমর

ইবনেল আস এর ব্যাপারে বর্ণনা করেছেন মাওয়ার্দি, ও আয়শা এবং রুবাই (রা)-এর ব্যাপারে সহীহ বুখারী ইত্যাদিতে বর্ণিত আছে।

আর তাবেয়ীদের মধ্যে সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব, সালেম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমর ইবনে হাসসান, খারেজা ইবনে যাইদ, কাযী শোরাইহ, সাঈদ ইবনে জোবাইর, আমর আশ্শাবী, আবদুল্লাহ ইবনে আবু আতিক, আতা ইবনে আবু রাবাহ, মুহাম্মদ ইবনে শেহাব যুহুরী, উমর ইবনে আবদুল আজিজ সা'দ ইবনে ইবরাহীম যুহুরী।

আর তবেতাবেয়ীদের সংখ্যা অসংখ্য। তাদের মধ্যে প্রসিদ্ধরা হলেন চার ইমাম, ইবনে উয়াইনা ও শাফেয়ী মাযহাবের সকল অনুসারী। ইবনে নাহাবীর কথা এখানেই শেষ। এসব কথা শাওকানী তার নাইলুল আউতারে উল্লেখ করেছেন।[১]

অবশ্যই কিছু শর্ত পূরণ করতে হবে

আমাদের ভুলে গেলে চলবেনা যে, গান শুনা বৈধ হবার জন্য কিছু শর্ত রয়েছে যা অবশ্যই পূরণ করতে হবে।

১. আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, সব গান হালাল নয়। এ বিষয়টির প্রতি আমরা পুনর্বার জোর দিতে চাই। আমরা বলতে চাই যে, গান হালাল হবার জন্য অবশ্যই তার বিষয়বস্তু ইসলামের শিক্ষা ও শিষ্টাচারের সাথে সঙ্গতিশীল হতে হবে। সুতরাং আবু নাওয়াছের এ গান কিছুতেই বৈধ হতে পারে না।

"আমার নিন্দা করো না, তোমার নিন্দা আমাকে আরও অনুপ্রাণীত করে, আমার চিকিৎসা করো সেই জিনিস দিয়ে যা আসলেই রোগ।"(অর্থাৎ মদ দ্বারা)

তেমনিভাবে কবি শাওকীর এ গানও বৈধ হতে পারে না।

"চলে গেছে রমযান অতএব দাও মোরে সাকী সুরার পত্র। সূরার আগ্রহে হৃদয় মোর ভারাক্রান্ত।"

এর চেয়ে আরও জঘন্য হলো ঈলিয়া আবু মাযীর 'আত তালাসিন' নামক গানের এ উক্তি।

এসেছি আমি এ ধরায় জানিনা কোথা থেকে, তবে আমি এসেছি এটা সত্য, সামনে রাস্তা দেখেছি তাই চলেছি, কিভাবে এসেছি ? কি করে রাস্তা দেখেছি? জানিনা।

---

১. শাওকানী, নাইলুল আউতার (বয়রুত, দারুলজিল) খ. ৮, পৃ. ২৬৪-২৬৬

কারণ এ গানে ঈমানের মূল তথা স্রষ্টা বিশ্বাস, পরকাল ও নবুওয়ত বিশ্বাসকে অস্বীকার করা হয়েছে।

অনুরূপভাবে অঞ্চলিক ভাষায় রচিত "কে মোরে বানাল" গানটিও ঈলিয়া আবু মাযীর গানের মতো ঈমানের মৌলিক বিষয়ে সন্দেহ সংশয় সৃষ্টি করে।

তেমনিভাবে "দুনিয়াটা সিগেরেট আর সুরার পাত্র আর কি" ? ইসলামী মূল্যবোধের পরিপন্থী, কারণ ইসলাম মাদক দ্রব্যকে নাপাক ও শায়তানের প্ররোচনার ফল বলে ঘোষণা দিয়েছে। ইসলামে যারা সুরা পান করে সুরা বানায়, বিক্রি করে, বহন করে, এমন কি সুরা তৈরীতে যেকোনো রকমের সহযোগিতা করে তাদের সকলকেই লা'নত ও বর্ৎসনা করা হয়েছে। তেমনিভাবে ধুমপানও একটা আপদ। এ আপদ মানুষের দেহ মন ও অর্থের বিরাট ক্ষতি করে।

যে সব গান জালিম সৈরাচারী ফাসেক শাসকদের প্রশংসা করে— যারা আমাদের এ উম্মতকে কোথাও না কোথাও শাসন করছে— তাও ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী। কারণ ইসলাম জালিম, জালিমদের দোসর এমন কি যারা জালিমের জুলুমের প্রতিবাদ করে না তাদের সকলকে লা'নত করে। সুতরাং যে গান তাদের প্রশংসা করে তার সম্বন্ধে ইসলামের অবস্থান নেতিবাচক।

আর যে গান সীমা লঙ্গনকারী ধর্ষক নারী-পুরষদের প্রশংসা করে সে গানও ইসলামী শিষ্টাচারের বিরোধী। কারণ ইসলামের মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে আহবান জানায় ঃ

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ -

বলো, মুমিনদেরকে, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে অবনত রাখে। (সূরা নূর ঃ ৩০)

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصٰرِهِم -

এবং বলুন নারীদেরকে তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে অবনত রাখে।

(সূরা নূর ঃ ৩১)

২. হয়ত গানের বিষয়বস্তু ইসলামী মূল্যবোধ ও ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী নয়। কিন্তু গায়ক গায়িকার গাওয়ার পদ্ধতি ও সুর তাকে হালালের সীমানা থেকে হারামের সীমানায় উপনিত করে। কিংবা সন্দেহজনক বা মাকরুহ স্থানে নিয়ে যায়। যেমন অনেক গান প্রচার করা হয় বা নারী ও পুরুষ তা শুনার জন্য আহবান জানায়। অথবা যাতে গায়ক গায়িকার কণ্ঠে এমন মাদকতা ও আকর্ষণ থাকে যা প্রবৃত্তি ও যৌন বৃত্তিকে জাগ্রত করে। কিংবা প্রেম প্রীতিতে শ্রোতাকে মাতাল করে ছাড়ে। বিশেষত যুবক যুবতীদের উত্তেজিত ও মাতাল করার জন্য সব ধরনের উত্তেজক ক্রিয়া কাণ্ড করা হয় থাকে।

আল-কুরআন নবী করীম (স) স্ত্রীদের সম্বোধন করে বলে ঃ

فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِىْ فِىْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ -

তোমারা (পর পুরুষের সাথে) কোমল ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা বলোনা, ফলে যার অন্তরে ব্যধি আছে সে (তোমাদের প্রতি) কুবাসনা (প্রকাশ) করতে পারে। (সূরা আহযাব ঃ ৩২)

কাজেই যদি কোমল কণ্ঠস্বরের সাথে ছন্দ, সুর, মিউজিক ও উত্তেজিত করার প্রক্রিয়া থাকে তাহলে কি হতে পারে অনুমেয়।

৩. তৃতীয় আর একটি বিষয় হলো, গানের সাথে হারাম কিছু থাকা চলবেনা। যেমন মদ্যপান, নারী-পুরুষের অবাদ মেলা-মেশা, বেপর্দা-বেহায়াপনা ইত্যাদি। প্রাচীনকাল থেকেই গান-বাজনার আসরে এসব হয়ে আসছে। যখনই গান-বাজনার অনুষ্ঠানের কথা আসে তখনই সাথে সাথে এসব বিষয়ের কথাও মনে পড়ে। বিশেষত নারীদের গান-বাজনার অনুষ্ঠানে এসব হয়ে থাকেই।

ইবনে মাজাহ ইত্যাদি গ্রন্থে বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীসটি এ কথাই বুঝায়। "আমার উম্মতের কিছু লোক মদ্যপান করবে। মদকে তারা অন্য নামে নামকরণ করবে। তাদের সামনে গায়িকা গান-বাজনা করবে। আল্লাহ তা'আলা তাদের সহ ভূমিধ্বস করাবেন। এবং তাদের মধ্য হতে বানর ও শুকর বানাবেন।"

আমরা এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করতে চাই। বিষয়টি হলো, অতিতে গান শুনার জন্য গানের আসরে যাওয়ার প্রয়োজন হতো, গায়ক গায়িকা ও তাদের সাঙ্গ-পাঙ্গদের সাথে মেলা-মেশা করতে হতো। এসব আসরে প্রায় শরীয়ত বিরোধী ও দ্বীন বিরোধী কর্মকাণ্ড হয়ে থাকত। কিন্তু আজকের দিনে গানের আসর ও গায়ক-গায়িকাদের থেকে দূরে অবস্থান করেও গান শুনা যায়। নিঃসন্দেহে এ বিষয়টি গানের ব্যাপারটিকে হালকা ও সহজতর করার ক্ষেত্রে অবদান রাখার একটা দিক হিসেবে চিহ্নিত হবে।

৪. গানের ক্ষেত্রেও অন্যান্য মোবাহ ও বৈধ জিনিসের মতো অতিরঞ্জন পরিহার করা আবশ্যক। বিশেষত আবেগ তাড়িত গান শুনার ব্যাপারে— যাতে প্রেম-প্রীতি নিয়ে কথা থাকে। কারণ মানুষ কেবল আবেগ সর্বস্ব প্রাণী নয়, আর আবেগও কেবল প্রেমে সীমাবদ্ধ নয়, আর প্রেমও কেবল নারীর সাথে সুনির্দিষ্ট নয়। আর নারীও কেবল দেহ ও যৌনাবেদন সর্বস্ব নয়। একারণেই আবেগ তাড়িত এসব প্রেমের গান কম শুনাই বাঞ্চনীয়। এবং আমাদের জীবনের অন্যান্য সব পরিকল্পনা ও গান শুনার মধ্যে একটা ভারসাম্য থাকা আবশ্যক। দ্বীন পালন ও দুনিয়া ভোগের মধ্যেও থাকতে হবে একটা সমতা ও

ভারসাম্যতা। আর দুনিয়া পালনের ক্ষেত্রেও থাকতে হবে ব্যক্তির অধিকার ও সমষ্টির অধিকার পালনে বা আদায়ে সাম্য। আর ব্যক্তিকেও রাখতে হবে তার বুদ্ধি-বিবেক ও আবেগের মধ্যে সামঞ্জস্যতা। তেমনিভাবে মানুষের সমস্ত আবেগের মধ্যেও যথাঃ প্রেম-প্রীতি, হিংসা, ঘৃণা, সৌর্যবির্য, সাহসীকতা, স্নেহ-মমতা, মাতৃত্ব-পিতৃত্ব, ভ্রাতৃত্ব, সততা ইত্যাদির মধ্যে ভারসাম্যতা। কারণ মানুষের সবধরনের আবেগেরই রয়েছে হক ও অধিকার।

বিশেষ কোনো আবেগ প্রকাশের ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ি অবশ্যই অপরাপর আবেগের জলাঞ্জলী দিয়ে ব্যক্তির বিবেক-বুদ্ধি আত্মা ও ইচ্ছাকে কোরবানী করে। এবং সমাজের অধিকার তার বৈশিষ্ট্য ও মূল্যবোধকে ধ্বংস করে, সর্বোপরি দ্বীন ধর্ম নৈতিকতা ও আদর্শকে নিঃশেষ করেই হতে পারে।

দ্বীন-ইসলাম অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ি সর্বক্ষেত্রেই এমন কি এবাদতেও হারাম ঘোষণা করে। কাজেই সে দ্বীন কি করে খেল-তামাশায় বাড়াবাড়ি ও অতির নকে প্রশয় দিতে পারে? তা বৈধ হলেও তাতে সর্বক্ষণ ব্যস্ত থাকাকে সমর্থন করতে পারে?

গান-বাজনা নিয়ে ব্যস্ত থাকা প্রমাণ করে যে, তাদের মন-মস্তিষ্ক বড় বড় কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে অসতর্ক। আরও প্রমাণ করে যে, তারা অনেক হক ও অধিকার আদায়কে তুচ্ছ জ্ঞান করে, যা আদায় করা মানুষের এই সংকীর্ণ জীবনে আবশ্যক ও কর্তব্য ছিল। ইবনে মুকাফফা যথার্থই সত্য বলেছেন, "যেখানেই অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ি আছে সেখানেই তার পাশাপাশি আছে অধিকার হরণ ও হক বিনষ্ট করণ।" আর হাদীস শরীফে আছে, বুদ্ধিমান মানুষ কেবল তিনটি জিনিসের জন্য লোভাতুর হতে পারে— জীবন যাপনে সচ্ছলতা আনয়ন, পরকালের জন্য সঞ্চয় বৃদ্ধি ও হারাম ছাড়া (হালাল) আনন্দ বিনোদন।

অতএব আমাদের উচিত এই তিনটি বিষয়ের জন্য আমাদের সময়কে যথাযথভাবে ভাগ করা। আমাদের আরও মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক মানুষকে তার জীবন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন। কিসে জীবন শেষ করেছে? আর কিসে তার যৌবন অতিবাহিত করেছে?

৫. এ আলোচনার পর আরও কিছু বিষয় থাকে যে ক্ষেত্রে প্রত্যেক গানের শ্রোতাকেই নিজের জন্য নিজেকে ফকীহ ও মুফতী হতে হয়। যদি গান অথবা বিশেষ কোনো গান তার প্রবৃত্তিকে তাড়িত করে তাকে আশ্লীল কাজে উদ্বুদ্ধ করে এবং তাকে সর্বদা কল্প জগতে নিয়ে যায়, তার মধ্যে আত্মিকতার ওপর পশুত্বকে প্রভাবিত করে তখন তাকে সে গান-বাজনা পরিহার করতে হবে। এবং সেই জানালা তাকে বন্ধ করে দিতে হবে যে জানালা দিয়ে তার মন-মানসিকতা

দ্বীন-ধর্ম ও চরিত্রের অভ্যন্তরে ফিৎনার বাতাস ডুকে পড়ে। এভাবেই তাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

মুসলমানদের বাস্তব জীবনে গান-বাজনা

যারা মুসলমানদের বাস্তব অবস্থার দিকে তাকায় এবং জীবন যাপন দেখে তারা ধার্মিক মুসলমানের জীবন এবং পুত পবিত্র গান শুনার মধ্যে কোনো সংঘাত দেখতে পায়না।

একজন সাধারণ মুসলমানের কর্ণ শ্রুতিমধুর সুর ও কণ্ঠস্বর দ্বারা প্রতিদিন আন্দোলিত ও পরিতৃপ্ত হয়। (হয়ত) কুরআন তেলাওয়াত দ্বারা যা মধুর সুরে সুললিত কণ্ঠে তাজবিদ সহকারে শ্রেষ্ঠ কারীদের তোলাওয়াতের মধ্যে পায়। অথবা আযান দ্বারা যা প্রতিদিন পাঁচবার সুমধুর কণ্ঠে ধনিত হয়। এটা নবীর যুগ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে চলে আসছে। নবী করীম (স) সেই সাহাবীকে— যিনি তার এক সত্য স্বপ্নে আযান পেয়ে মহানবীর কাছে তার বর্ণনা দেন— বলেন, "তা বেলালকে শিখিয়ে দাও কারণ সে তোমার চেয়ে বেশি সুমধুর সুরের অধিকারী।"এবং ধর্মীয় মুনাজাত দ্বারা যা সুমিষ্ট সুরে সুললিত কণ্ঠে করা হয়। ফলে হৃদয় নম্র হয় ও অনুভূতিতে নাড়া দেয়। তেমনিভাবে রাসূল গাথার মাধ্যমে। যা মুসলমানরা যুগ যুগ ধরে শুনে আসছেন সেই সময় থেকে যখন আনসারী মেয়েরা গেয়েছিলেন সুমিষ্ট কণ্ঠে রাসূলের মদীনায় আগমন উপলক্ষে ঃ

طلع البدر علينا من ثنياتالوداع وجب الشكر علينا مادعاللّٰه داع -

আমার মনে পড়ে আমি এ সঙ্গীতটি ইন্দোনেশিয়ার এক মাদ্রাসায় ছোট ছোট মেয়েদের কণ্ঠে শুনেছিলাম, তারা সমস্বরে কোরাশ গাচ্ছিল মধুর সুরে। তখন আমরা কাতারের একটা প্রতিনিধি দল গিয়েছিলাম। এ সঙ্গীতের প্রভাবে তখন আমাদের চোখে পানি এসে গিয়েছিল এবং আমাদের হৃদয় নম্র হয়ে পা পড়েছিল।

অতীত যুগে মুসলমানরা নিজেদের জন্য এমন কিছু শ্রুতিমধুর সুর অবিস্কার করেছিলেন যা দ্বারা তারা নিজেদের মনে শান্তি ও প্রশান্তি আনয়ন করতেন, এবং তাদের জীবনকে আনন্দে ভরে দিতেন। বিশেষ করে গ্রামে গঞ্জে। আমরা শিশু কালে ও যৌবনের প্রারম্ভে এসব সুমধুর লোক সঙ্গীত শুনেছি। তা সবই ছিল পরিবেশ থেকে সৃষ্ট স্বভাবজাত গান হৃদয়ের গাঁথা। তাতে তাদের মূল্যবোধ প্রতিফলিত হতো তার পরিপন্থী কোনো কিছু থাকত না।

এর মধ্য হতে 'মোয়েল' নামক লোক সঙ্গীতের কথা বলা যায়। লোকেরা এসব সঙ্গীত নিজেরা গাইত এবং তা শুনার জন্য জামায়েত হতো। তা গাইত

তাদের মধ্যে মিষ্টি কণ্ঠের অধিকারীরা। সেসব সঙ্গীতে থাকত ভালোবাসা প্রেম-প্রীতি মিলন-বিরহ ইত্যাদি বিষয়। কোনো কোনো সঙ্গীতে থাকত দুনিয়ার ভোগ বিলাসের কথা এবং মানুষের জোর জুলুমের বিরুদ্ধে অভিযোগ .... ইত্যাদি বিষয়।

এসব সঙ্গীত গাওয়া হতো বাজনা বিহীন, কিছু কিছু গাওয়া হত 'অরগান'সহ। এসব স্বভাব জাত শিল্পিদের মধ্যে কেউ কেউ "মাওয়াল" নামক সঙ্গীত রচনা করত এবং তা সুর দিয়ে নিজেই গাইত।

এর মধ্যে আর কিছু হলো চন্দবদ্ধ গল্প (পুঁতি সাহিত্য)। এসবে জাতীয় বীরদের জীবনী গেয়ে শুনানো হতো। তাদের বীরত্ব প্রতিরোধ ও ধর্যের কাহিনী শুনানো হতো। লোকেরা তা শুনত আর নিজেরা গাইত। এমন কি তারা পুরো গল্পটিই মুখস্ত করে নিত। যেমন ঃ আদহাম শরকাবীর গল্প, শফিক মুতওয়াল্লীর কিচ্ছা, আয়ুব মিসরির ও ইয়াতীম সা'দের বস্তানী ইত্যাদি।

এর মধ্যে আর কিছু হলো জাতীয় বীরদের জীবনী কেন্দ্রিক মহাকাব্য। যেমন আবু যাইদ হেলালী নামক মহাকাব্য। এ মহাকাব্যের গল্প শুনার জন্য লোকেরা জমায়েত হতো এবং গল্পের সাথে গল্পের নায়কদের গান গুলোও লোক কবিদের মুখ থেকে "রাবাবা" নামক সূরে শুনত। এ সুর কেবল এ জাতীয় মহাকাব্যের জন্যই নির্দিষ্ট ছিল। অনেকেই এসব মহাকাব্যের প্রেমিক ছিল। এসব মহাকাব্য আজকের দিনের ধারাবাহিকের মতো গাওয়া হতো।

এর মধ্য হতে আর এক ধরনের গান হলো ঈদ উৎসব ও আনন্দ বিনোদন উৎসব ইত্যাদি যথা ঃ বিয়ের অনুষ্ঠান, জন্ম দিনের অনুষ্ঠান, শিশুর খতনানুষ্ঠান, কারো আগমন অনুষ্ঠান, অভ্যর্থনা অনুষ্ঠান, রোগমুক্তি উৎসব, হাজীদের সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান ইত্যাদির গান।

মানুষ নিজেরাই অনেক ধরনের গান অবিষ্কার করেছে এবং তা বিভিন্ন উৎসবে গেয়েছেন, যেমন ফসল কাটার গান, নবান্যের গান ইত্যাদি।

শ্রমিক ও কামলাদের কোরাশও অনুরূপ, যারা নির্মাণ কাজ করতে গিয়ে বা কোনো ভারী কিছু উত্তোলন করতে গিয়ে সমস্বরে গেয়ে যায়। যথা ঃ হেইয়্যা, হেইয়্যা, আল্লাহ্র নামে হেইয়্য, আরও জোরে হেইয়্য ইত্যাদি। এসব গানের সাহাবাদের আমল থেকে শরীয়তের ভিত্তি আছে। সাহাবারা যখন মসজিদে নববী নির্মাণের জন্য দূর থেকে নিজেদের কাঁধে পাথর বহন করে নিয়ে আসছিলেন তখন তারা সমস্বরে কোরাশ গাচ্ছিলেন ঃ

اللّٰهُمَّ اِنَّ العيش عيش الآخرة فاغفر للانصار والمهاجره

হে আল্লাহ প্রকৃত জীবন তো আখিরাতের জীবন। সুতরাং আনসার ও মুহাজিরদের তুমি ক্ষমা করে দাও।

এমন কি মায়েরা যখন তাদের শিশুদের আদর করেন বা তাদের ঘুম পড়াতে চান তখন তারা গান ঘুম পাড়ানীর গান। এরূপ কিছু বিখ্যাত ঘুমপাড়ানী গান হলো ঃ يا رب ينام، يا رب ينام —হে খোদা ঘুমিয়ে দাও, হে খোদা ঘুম এনে দাও।

আমার এখনও রমযান মাসে সেহরীর সময় ডাকুয়াদের কথা মনে পড়ে। তারা মধ্য রাতের পর লোকদের ঘুম থেকে জাগাবার জন্য ঢোল বাজিয়ে সুরেলা কণ্ঠে ঘুম জাগানো গান গাইত।

এখানে যে চমৎকার গানের কথা উল্লেখ করা যায় তা হলো, হকার ও ফেরীওয়ালাদের গান। তারাও তাদের পণ্য বিক্রি করার জন্য চমৎকার গান গায় সুর দিয়ে। এসব গানের মাধ্যমে পণ্য বিক্রি করার জন্য পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা করে। যেমন তা কাপড় বিক্রেতা হকাররা এবং সবজি বিক্রেতা ফেরীওয়ালারা করে থাকে।

এভাবেই আমরা দেখতে পাই যে, এই শিল্পটি তথা গান আমাদের গোটা ধর্মীয় ও দুনিয়াবী জীবনের সাথে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছে। মানুষ এমনি এমনি স্বভাবিক ভাবেই তা গেয়ে যায়। এর সাথে তাদের দ্বীন-ধর্মের সাথে কোনো সংঘাত আছে বলে তারা মনে করে না। আর আলেমরাও এসব সামাজিক গানে মধ্যে নিন্দা করার মতো কিছু আছে বলে মনে করেন না। বরং দেখা যায়, এসব গানে প্রায় ধর্মের বাণী, ঈমানের কথা, মূল্যবোধ ও উত্তম চরিত্রের কথা অর্থাৎ আত্মা ও দেহের কথা একাকার হয়ে আছে। তাতে আছে তওহীদের বাণী, আল্লাহ্‌র জিকির, দো'আ, দরুদ ইত্যাদি।[১]

এসব জিনিস যা আমি মিসরে দেখেছি তা শ্যাম রাজ্যে ও অন্যান্য প্রতীচ্যের দেশসমূহেও দেখেছি।

পরবর্তী যুগের লোকেরা কেন গান বিষয়ে এত কঠোর নীতি অবলম্বন করে ?

প্রথম যুগে ফকীহদের তুলনায় পরবর্তী যুগের ফকীহদেরকে গানের ব্যাপারে বেশি কঠোর নীতি অবলম্বন করতে দেখা যায়। এর বিভিন্ন কারণ রয়েছে। যেমনঃ

১. সামাজিক গানে ধর্মীয় দৃষ্টিতে নিন্দনীয় কিছু পাওয়া যায় না। তাবে কান্নার জন্য ভাড়া খাটুনী মহিলারা যেসব গান করে তাতে কান্নার উদ্রেককারী ও ভয় ভিতি সৃষ্টিকারী উপাদান থাকে এবং বিপদ গ্রস্ত লোকদের ধর্য হারানোর ও আল্লাহ্‌র ফয়সালা মেনে না নেয়ার মতো উপাদান থাকে যা শরীয়তে নিন্দনীয়।

১. সহজতা বাদ দিয়ে অধিক সাবধনতা অবলম্বন

মুতাকাদ্দেমীন তথা পূর্ববর্তী ফকীহ্রা সব সময় সহজ নীতি অবলম্বন করতেন। আর মুতাআখখেরীন তথা পরবর্তী ফকীহ্রা সবধানতার নীতি বেশি অবলম্বন করে থাকেন। সাবধানতা মানে কঠোর ও কষ্টকর নীতি অবলম্বন। যারা সাহাবাদের যুগ থেকে পরিবর্তী যুগের ফিকাহ্র বিধান ও ফতায়াগুলো দেখবে তারা অবশ্যই সুস্পষ্টভাবে দেখতে পাবে যে, এটাই হয়েছে। এর অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে।

২. দুর্বল ও জাল হাদীস দ্বারা প্রভাবিত হওয়া

পরবর্তী যুগের অসংখ্য ফকীহ্ জাল ও দুর্বল হাদীসের খপ্পরে পড়েছে। কারণ জাল ও দুর্বল হাদীসের বহু গ্রন্থ সংকলিত হয়েছে। আর তাদের হাদীস যাচাই বাছাই করার এবং সনদ পর্যবেক্ষণের ক্ষমতা না থাকায় তারা এসব হাদীসের খপ্পরে পড়েছে। বিশেষত এ কারণেও যে, তারা শুনেছে যে, দুর্বল হাদীসের সংখ্যাধিক্যতা একে অপরকে শক্তিশালী করে তোলে।

৩. গানের বাস্তবতার চাপ

গানের বাস্তবতা যাতে কিনা বক্রতা ও সীমালঙ্গন রয়েছে তাও গানকে হারাম ও নিষিদ্ধ বলে অভিমত দানের ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রেখেছে। এই বাস্তবতার দুটি রূপ রয়েছে। এতদুভয় রূপের প্রত্যেকটি এক দল ফকীহ্র ওপর প্রভাব ফেলেছে।

অশ্লীল ও অবাঞ্ছিত গান

প্রথম রূপটি হলো অশ্লীল গানের রূপ যা কিনা এক শ্রেণীর মানুষের জীবনের সাথে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে গেছে। তারা ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে পড়েছে। নামায-রোযা ইত্যাদি পরিহার করে প্রবৃত্তির পশ্চাতে তাড়িত হয়েছে। এ ধরনের গানের সাথে ফাসেকী, মদ্যপান, মিথ্যা বলা একাকার হয়ে গেছে। সুন্দরী নারী গায়িকারা মানুষের বিবেক বুদ্ধি নিয়ে খেল-তামাশা আরম্ভ করেছে। এরূপ অশ্লীলতা আব্বাসী যুগে এক সময় বিস্তৃতি লাভ করেছিল।

গান শুনার জন্য তখন এসব অশ্লীল কুরুচিপূর্ণ অনুষ্ঠানে যেতে হতো, যেখানে হতো আল্লাহ্র নাফরমানী। দুঃখের বিষয় বর্তমান যুগেও শিল্পাঙ্গনের পরিবেশ এরূপেই রয়ে গেছে। এসব মহামারী এখনও চলছে। একারণেই যেসব নারী ও পুরুষ শিল্পী আল্লাহ্র মেহেরবানী ও তওফিকে আল্লাহ্র দিকে প্রত্যর্পণ করতে চায় তাদেরকে বাধ্য হতে হয়েছে এ পরিবেশ থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে নিজের দ্বীন ঈমান বাঁচাতে।

সুফীদের গান-বাজনা

দ্বিতীয় রূপটি হলো সুফীদের ধর্মীয় গানের রূপ। সুফীরা এ ধরনের গানকে আল্লাহ্র প্রতি ভক্তি ও আগ্রহ সৃষ্টির মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে। এবং হৃদয়কে আল্লাহ্র পথে চালার জন্য প্রস্তুত করার প্রয়াস পেয়েছে। যেমন উট চালকরা উট চালাবার মাধ্যম হিসেবে 'হুদা' নামক গানকে ব্যবহার করেছে। ফলে এসব সুরেলা কণ্ঠে চন্দবদ্ধ গান শুনে উটগুলো তৎপর হয়ে ওঠে এবং তাদের চলা দ্রুতগামী করে। তখন ভারী বোঝাও তাদের কাছে হালকা আর দীর্ঘ বন্দুর পথও সংক্ষিপ্ত বলে মনে হতে থাকে। তাই সুফীরা এ ধরনের ভক্তিমূলক গান শুনাকে এবাদত অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য লাভের মাধ্যম বা আল্লাহ্র এবাদতের ও নৈকট্য লাভের সহযোগী মনে করেছে।

তাদের এ ধরনের মনোবৃত্তির নিন্দা করেছেন শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ও তদীয় শিষ্য ইবনে কাইয়্যেম। তারা উভয়ে গানের প্রতি কঠোর ও তীব্র আক্রমণ করেছেন। বিশেষত ইবনে কাইয়্যেম। তিনি তার 'ইগাছাতুল লাহফান' নামক গ্রন্থে তার সমস্ত অস্ত্র জড়ো করে ঘোড়া ও সৈনিক দিয়ে তীব্র আক্রমণ করেছেন গান হারাম প্রমাণ করার জন্য। এবং তার অভ্যাসের বিপরীত হওয়া সত্ত্বেও সহীহ নয় ও সুস্পষ্ট নয় এমন দলিল প্রমাণ ব্যবহার করেছেন। কারণ তখন তাঁর সামনে ছিল উপরোক্ত প্রকারের গান। তিনি এবং তাঁর শিক্ষক মনে করেছেন যে, এর মাধ্যমে সুফিরা এমন একটি বিষয়কে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করছে যা আল্লাহ্ মাকরু বা বৈধ করেননি। তারা এর দ্বারা নবীর ও সাহাবীদের যুগে ছিলনা এমন একটা বিদআত সৃষ্টি করার প্রয়াস পেয়েছে। এর সাথে অন্যান্য বিদআতও সম্প্রিক্ত করেছে— বিশেষত তা যদি গাওয়া হয় মসজিদে। ইবনে কাইয়্যেম তাদের প্রতি আক্রমণ করতে গিয়ে কবিতার ভাষায় বলেন ঃ

تُلِيَ الكتاب فاطرقوا لاخيفة - لكنه أطراق لاهٍ ساهي

واتى الغناء فكا لحجر ثنا هقوا - والله ما رقصوا لاء جل الله

دفٍّ مزو مار، ونغمة شادن - فمتى رايت عبادة يملاهى ؟

কিতাবুল্লাহর তেলাওয়াত করা হয়েছে তখন তারা মাথা অবনত করেছে। তবে এ মাথা নত করণ ভয় ভিতির কারণে নয়, অনন্দ ফূর্তির উদ্দেশ্যে, আর যখন গান গাওয়া হলো তখন তারা গাধার মতো চিৎকার করে উঠল, আল্লাহ্র কসম তারা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে নৃত্য করেনি। তারা নৃত্য করেছে সুরা ও

গান-বাজানার তালে তালে হরিনের বাচ্চার মতো। কখনও কি আনন্দ ফূর্তির মাধ্যমে ইবাদত করতে কাউকে দেখছ?

অবশ্য ইবনে তাইমিয়ার কোনো কোনো ফতায়ায় আনন্দ-বিনোদনের উদ্দেশ্যে বা চিন্তামুক্ত হবার জন্য গান গাওয়া ও শুনা বৈধ বলে মন্তব্য করা হয়েছে।

এ বিষয়ে ইমাম গাজালীর অবিস্কার-উদ্ভাবনা

গান প্রসঙ্গে ইমাম গাজালীর অবস্থান, গান হারামকারীদের দলিল-প্রমাণের তাঁর তাত্ত্বিক জবাব ও হৃদয়গ্রাহী যুক্তি উপস্থাপন এবং গান বৈধকারীদের দলিল ও যুক্তির পক্ষে তার যৌক্তিক অবস্থান, এবং বৈধ গান শুনার পথে যেসব বাঁধা সৃষ্টি হবার ফলে তা হারামে পরিণত হয় তা নির্ধারণ একটা ন্যায়সঙ্গত অবস্থান, যা শরীয়তের প্রশস্ততা ও মধ্যমনীতি অবলম্বন এবং সব পরিবেশ পরিস্থিতির উপযুক্ত হবার সাথে সঙ্গতশীল।

সত্য কথা হলো, এহইয়াউ উলুমুদ্দিনে ইমাম গাজালীর ফিকাহ বিষয়ক অবস্থান মাযহাব গণ্ডিমুক্ত একটা ব্যাপক অবস্থান। তিনি এ গ্রন্থে শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী থাকেননি; বরং এতে তিনি একজন মুজতাহিদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। তিনি প্রশস্ততার সাথে শরীয়তের দিকে তাকিয়েছেন। বিভিন্ন স্থানে তার এ অবস্থান স্পষ্ট দেখা গেছে। যা বিশেষভাবে গবেষণার উপযোগী। এ বিষয়ে পিএইচডির একটা থিসিসও হতে পারে।

যেসব কারণে গান শুনা বৈধ থেকে হারামে পরিণত হয়

ইমাম গাজালী এমন পাঁচটি বিষয় উল্লেখ করেছেন, যে বিষয়গুলো গান শুনাকে বৈধতা থেকে হারামের স্তরে উপনীত করতে পারে। সে বিষয়গুলো হলোঃ

১. গায়কের কারণে, যথা গানের গায়ক যদি এমন কোনো নারী হয় যাকে দেখা বৈধ নয়, তাকে দেখে গান শুনতে গেলে ফিৎনার ভয় থাকে, এমতাবস্থায় গান শুনা হারাম। আর এ হারাম গানের কারণে নয় বরং গায়িকার প্রতি আশক্তির কারণে ও ফিৎনা সৃষ্টির কারণে।

এক্ষেত্রে ইমাম গাজালী কেবল তখনই গান শুনা হারাম বলে মন্তব্য করেন যখন ফিৎনার ভয় দেখা দেয়। আর তিনি তার এ অভিমত ব্যক্ত করে হযরত আয়শার বাড়িতে দুই গায়িকার গান গাওয়ার ভিত্তিতে। কারণ তা থেকে জানা যায় যে, গায়িকাদের গান রাসূল (স) শুনছিলেন, তা পরিহার করেননি। কিন্তু এ

শুনায় তাঁর ফিৎনায় পড়ার কোনো ভয় বা আশংকা ছিল না। এ কারণেই তিনি তাদের গানের শব্দ পরিহার করেননি। সুতরাং এ থেকে বুঝা গেল যে ফিৎনায় পড়ার সম্ভাবনাটা গায়ক, গায়িকা এবং শ্রোতা নারী-পুরুষদের অবস্থান তথা তারা যুবক-যুবতী হবার ওপর নির্ভর করে। অবস্থার প্রেক্ষিতে হুকুম ব্যতিক্রম হওয়া অসম্ভব নয়, কারণ আমরা তো বলে থাকি যে, বৃদ্ধ লোক রোযা রেখে তার স্ত্রীকে চুমু দিতে পরবে কিন্তু যুবকেরা পারবে না।

২. আর একটি বাহ্যিক বিষয় হতে পারে বাদ্যযন্ত্রে। যেমন বাদ্যযন্ত্রটি হতে পারে মাতাল মদখোর ও নুপুংসকদের বিশেষ পরিচয় বাহক। আর তা হচ্ছে বাঁশি, গিটার এবং পান-পাত্রের ঢোল। এই তিন প্রকারের বাদ্যযন্ত্র নিষিদ্ধ। এ ছাড়া বাকি বাদ্যযন্ত্র মূলত মুবাহ্ অর্থাৎ বৈধ। যেমন তবলা— এমনকি তাতে ঝুনঝুন থাকলেও— ঢোল এবং কাঠি দ্বারা বাজানো যন্ত্র ইত্যাদি।

৩. আর একটি বাহ্যিক বিষয় হতে পারে গানের বিষয়বস্তু বা বক্তব্য। যদি তাতে অশ্লীলতা, পরনিন্দা বা আল্লাহ-রাসূলের প্রতি মিথ্যারোপ কিংবা সাহাবাদের প্রতি মিথ্যারোপ জাতীয় কিছু থাকে। যেমন রাফেজীরা সাহাবাদের নিন্দা করে গান লিখেছে। এ জাতীয় গান শুনা হারাম। তা সুর দিয়ে হোক বা সুর ছাড়াই হোক। এ জাতীয় গানের শ্রোতারাও লেখক ও গায়কের সাথে শামিল ও শরিক। তেমনিভাবে যে গানে কোনো বিশেষ নারীর বিবরণ আছে সে গানও শুনা হারাম। কারণ কোনো বিশেষ নারীর বিবরণ দান পর-পুরুষের সামনে বৈধ নয়। তবে নারীর অবয়ব গড়ন গণ্ডদেশ ইত্যাদির বিষয় দিয়ে কাব্য রচনা অবৈধ নয়। সত্য কথা হলো, এ ধরনের কাব্য রচনা ও তা সুর সহ বা সুর ছাড়া গাওয়া অবৈধ নয়। তবে শ্রোতার অবশ্যই তা বিশেষ কোনো নারীর ওপর আরোপ করা চলবেনা। আর যদি একান্তই কোনো নারীর ওপর আরোপ করতে চায় তাহলে তা অবশ্যই এমন নারীর ওপর আরোপ করতে হবে যার ওপর আরোপ করা তার জন্য বৈধ। আর যদি তা কোনো পর-নারীর ওপর আরোপ করে তবে সে এ কারণে গুনাহগার হবে। আর যার অবস্থা এরূপ তাকে অবশ্যই গান শুনা থেকে নিজেকে বিরত রাখতে হবে।

৪. আর একটি বাহ্যিক বিষয় হতে পারে গান উপভোগকারীতে। আর তা হতে পারে যদি তার যৌন কামনা তীব্র হয়। এবং সে পূর্ণ যৌবনে অবস্থান করে। অন্যদের চেয়ে তার মধ্যে এ ধরনের উত্তেজনা তীব্রতর হয় তাহলে তার জন্য গান শুনা হারাম। এর দ্বারা তার হৃদয় কোনো বিশেষ লোকের প্রেমে জড়িয়ে পড়ুক বা না পড়ুক। যাই হোকনা কেন, যদি তার অবস্থা এমন হয় যে, যখন সে কারো জুলফি ও গণ্ড দেশের বিবরণ শুনে মিলনের ও বিরহের কথা

শুনে তাতেই তার উত্তেজনা তিব্রতর হয় এবং তখন যে কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির ওপর তা আরোপ করে এবং শয়তান এসব বিষয় নিয়ে তার হৃদয়কে আলোড়িত করতে থাকে ফলে তার উত্তেজনা ও কামনা বৃদ্ধি পায় আর মন্দের উদ্রেক দীর্ঘয়িত হতে থাকে, (তাহলে তার জন্য এ ধরনের গান শুনা হারাম)।

৫. শ্রোতা যদি সাধারণ মানুষ হয় যার অন্তরে আল্লাহ্‌র প্রেম বাসা বাঁধেনি, ফলে গানেই তার অন্তরকে আবিষ্ট করে নিয়েছে, এমতাবস্থায় গান তার অন্তরে উত্তেজনা সৃষ্টি না করলেও তার জন্য গান শুনা নিষিদ্ধ হবে। তবে তা তার জন্য অন্যান্য বৈধ জিনিসের মতো বৈধ হতে পারে যদি তা শুনা তার অভ্যাস ও স্বভাবে পরিণত না, হয় সব সময় তা নিয়ে ব্যাস্ত না হয়ে পড়ে। কারণ এধরনের ব্যক্তিদেরকে শরীয়তের ভাষায় নির্বোধ বলা হয়, যাদের সাক্ষ গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ খেল-তামাশায় ব্যস্ত থাকা একটা অপরাধ। ছাগীরা গুনাহ্ বার বার করতে থাকলে তা যেমন কবীরাহ গুনাহতে পরিণত হয়, তেমনিভাবে কোনো কোনো বৈধ কাজে লেগে থাকার কারণে তা ছাগীরা গুনাহে পরিণত হয়। এ ধরনের একটা কাজ হলো দাবা খেলা, এ খেলা একটা মোবাহ্ বা বৈধ খেলা। তবে সর্বদা এ খেলায় ব্যস্ত থাকা একটা বড় মাকরুহ কাজ। সব বৈধ কাজই বেশি ও অতিরিক্ত করা বৈধ নয়; বরং রুটিও একটা বৈধ খাবার, এ খাবারও অতিরিক্ত খাওয়া অন্যান্য বৈধ জিনিসের মতো হারাম।[১]

এসব বাহ্যিক জিনিস যার কারণে গান হারাম হয়ে যায় বলে ইমাম গাজালী উল্লেখ করেছেন। তিনি তাতে গিটার ও বাঁশিকে হারাম হবার একটা বাহ্যিক কারণ বলে উল্লেখ করেছেন। এ ভিত্তিতে যে শরীয়তে তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

তিনি এসব নিষিদ্ধ হবার কারণ ইজতিহাদ করে বের করেছেন এবং তার অতি চমৎকার ব্যাখ্যা দান করেছেন। তিনি বলেছেন শরীয়ত এ সব জিনিস উপভোগ্য হবার কারণেই নিষিদ্ধ করেনি। কারণ উপভোগ্য হবার কারণে নিষিদ্ধ হলে যেসব জিনিস মানুষ উপভোগ্য মনে করে সব কিছুকে তার ওপর কিয়াস করা যেত। কিন্তু মদ হারাম করা হলো, আর তার প্রতি মানুষের তীব্র আশক্তির কারণে তা থেকে মুক্ত করার প্রয়োজন হলো। কিছু অতিরিক্ত কড়াকড়ি আরোপের ফলে প্রথম দিকে মদ তৈরীর হাণ্ডি পাতিল ও মটকা ভাঙ্গার আদেশ দেয়া হলো। সাথে সাথে মদ্যপায়ীদের সব চিহ্ন ও প্রতিক পর্যন্ত হারাম ঘোষণা করা হলো। যেমন গিটার ও বাঁশি। এতদুভয় বস্তু হারাম ঘোষণার বিষয়টি ছিল অনুগামী হিসেবে। যেমন পর-নারীর সাথে একান্তে সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

---

১. গাজালী, এহইয়াউ উলুমুদ্দিন, কিতাবুস সিমা, দারুশ শাব, ১১৪২-১১৪৫ হিঃ। পৃ. ১১৪২-১১৪৫

কারণ তা হচ্ছে ব্যবিচারের প্রথম দাপ। আর রানের প্রতি দৃষ্টিদান নিষিদ্ধ করা হয়েছে কারণ তাহলো যৌনাঙ্গের সাথে সম্প্রিক্ত। আর সল্প মদ্যপান হারাম ঘোষণা করা হয়েছে যদিও তা মাতাল না করে, কারণ তা একদিন মাতলামী পর্যন্ত নিয়ে গড়ায়। এমনিভাবে সব হারাম বস্তুর চার পাশে এমন কিছু সীমানা থাকে যার দিকেও হারাম হবার হুকুম অর্পিত হয়, যাতে প্রকৃত হারাম থেকে বাচানো যায় এবং তার চতুষ্পার্শ্বে সীমানা ভেড়ি গড়ে ওঠে। ফলে তা অতিক্রম অসম্ভব হয়ে পড়ে।

গিটার ও বাঁশি (শুনা) হারাম ঘোষণা করা হলো মদের অনুগামী হবার জন্য, তিনটি কারণে।

প্রথম কারণটি হলো ঃ এতদুভয় জিনিস মদ্যপানের দিকে ধাবিত করে। কারণ এর মাধ্যমে যে আনন্দ ফূর্তি অর্জিত হয় তা শেষ পর্যন্ত মদ পর্যন্ত গড়ায়।

দ্বিতীয় কারণটি হলো ঃ এতদুভয় জিনিস যারা সদ্য মদ ছেড়েছে তাদেরকে মদ পানের ও তার আসরের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আর এই স্মরণ করিয়ে দেয়াটি হয় হৃদয়ে তার প্রতি আশক্তি সৃষ্টি এবং পা বাড়ানোর পদক্ষেপ গ্রহণের ইন্দন।

আর তৃতীয় কারণটি হলো ঃ এতদুভয় বাদ্যযন্ত্রের আসর মূলত ফাসিক ফাজির লোকদের আসর, কাজেই তাদের অনুগামী অনুসারী হতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ যারা কোনো গোষ্টি ও দলের অনুগামী হয় তারাও তাদেরই অন্তর্ভুক্ত বলে পরিগণিত হয়।

ইমাম গাজালী এরূপ চমৎকার ব্যাখ্যা দান ও আলোচনার পর বলেন, এথেকে প্রমাণীত হলো এসব হারাম হবার কারণ কেবল এটা নয় যে, এর দ্বারা পবিত্র আনন্দ উপভোগ করা হয়। বরং যুক্তি ও কিয়াস হলো সব পবিত্র জিনিসই হালাল কেবল সে সব জিনিস ব্যতিত যাকে হালাল করার করণে ফিৎনা ফ্যাসাদ সৃষ্টি হতে পারে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِىْٓ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَالطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ -

বলো কে হারাম করেছে আল্লাহ কর্তৃক তার বান্দাদের জন্য সৃষ্ট সৌন্দর্য এবং পবিত্র রিযিককে ।[১]

আল্লাহ ইমাম গাজালীকে দয়া করুন, বাস্তবতা হলো তিনি যে গিটার ও বাঁশি হারাম মনে করেন তা হারাম সাব্যস্ত করার জন্য কোনো সুস্পষ্ট নির্ভরযোগ্য দলিল আনেননি, যা থেকে প্রমাণ হয় এসব হারাম। তিনি এ বিষয়ে

১. গাজালী এহইয়াউ উলুমুদ্দিন, পৃ. ১১২৮, আয়াতটি সূরা আরাফের ঃ ৩২

বর্ণিত হাদীসগুলোকে নির্ভরযোগ্য মনে করেছেন। অতপর সে হাদীসগুলোর এ ব্যাখ্যা দানের প্রয়াস চালালেন যা আমরা আলোচনা করেছি। তিনি যদি জানতে পারতেন এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হাদীসগুলোর সনদ নির্ভরযোগ্য নয়, তাহলে এ রূপ ব্যাখ্যা দানের এ প্রয়াস চালাতেন না। যাই হোক এ ব্যাখ্যা অতী চমৎকার এবং উপকারী ঐসব লোকদের জন্য যারা ঐ সব হাদীস দুর্বল মানতে নারাজ।

হারাম শব্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রে শিথিলতা প্রদর্শনের প্রতি সতর্কতারোপ

আমরা আমাদের এ আলোচনার শেষ প্রান্তে এসে সেই আলেম সমাজের উদ্দেশ্যে যারা হারাম শব্দ ব্যবহারকে হালকা ভাবে দেখেন এবং তাদের ফতোয়ায় ও লিখনিতে তা ব্যাপকাকারে ব্যবহার করেন তাদের উদ্দেশ্যে একটা কথা বলতে চাই, তারা যেন এ হারাম বলার ব্যাপারে আল্লাহকে হাজির নাজির জানেন। আর যেন মনে রাখেন এই 'হারাম' শব্দটি অতি (গুরুত্বপূর্ণ ও) মারাত্মক। এ শব্দ বুঝায় যে, যারা এ হারাম কর্ম করবে তাদের ওপর আল্লাহ তা'আলার শাস্তি আপতিত হবে। আর এ বিষয়টি কারো আন্দাজ-অনুমান ও মেজায মর্জির ওপর ভিত্তি করে কিংবা দুর্বল হাদীসের ওপর নির্ভর করে বা কোনো পুরাতন গ্রন্থের বক্তব্যের ওপর ভিত্তি করে বলা যায় না। হারাম প্রমাণ করা যায় কেবল সহীহ ও নির্ভরযোগ্য দলিলের সুস্পষ্ট বক্তব্যের ওপর ভিত্তি করে, কিংবা নির্ভরযোগ্যভাবে প্রমাণীত ইজমার আলোকে। আর যদি এরূপ দলিল-প্রমাণ না থেকে তাহলে মনে রাখেত হবে যে, হালাল ও বৈধতার গণ্ডি বিস্তৃত। এ প্রসঙ্গে তাদের জন্য সালফে সালেহীনদের উত্তম আদর্শ রয়েছে।

ইমাম মালেক বলেন, হালাল হারাম প্রসঙ্গের কোনো মাসয়ালা সম্পর্কে আমি জিজ্ঞাসিত হলে নিজেকে খুব ভারাক্রান্ত মনে হয়। কারণ হালাল ও হারাম হলো আল্লাহ্‌র হুকুমের চূড়ান্ত কথা ও ফয়সালা। আমি আমাদের দেশের জ্ঞানী গুনী ফকীহ ও আলেমদের দেখেছি তাদের কাউকে যখন কোনো প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করা হতো তখন তাদের অবস্থা হতো মৃত্যু যেন তাদের দুয়ারে এসে হানা দিয়েছে, আর এ যুগের লোকদের দেখতে পাচ্ছি যে, তারা ফতোয়া দিতে বড়ই আগ্রহি। তারা যদি জানতে পারত কাল কিয়ামতে এ জন্যে কি অপেক্ষা করছে তাহলে তারা কম ফতোয়া দিত। ওমর ইবনে খাত্তাব (রা) আলী (রা) এবং অন্যান্য প্রসিদ্ধ সাহাবীদেরকে বিভিন্ন মাসয়ালা জিজ্ঞেস করা হতো (আর তারা হলেন সেই শ্রেষ্ঠ যুগের লোক যেখানে নবী করীম (স)-কে নবী রূপে প্রেরণ করা হয়েছে) তখন তারা রাসূল (স)-এর সাহাবাদের জমা করে জিজ্ঞাসা করার পর (জেনে নিয়ে) জবাব দিতেন। ফতোয়া দিতেন। আর এযুগের লোকদের অহংকারের বিষয় হলো, একটুতেই তাদের জ্ঞানের দরজা খুলে যায়।

তিনি (ইমাম মালেক) আরও বলেন, সেকালের লোকদের এবং সালফে সালেহীনদের (যাদের অনুসরণ করতে হয় এবং যাদের অনুসরণের ওপরই ইসলাম নির্ভর করে তাদের) অবস্থা ছিল এই যে, তারা কখনও এটা হালাল ওটা হারাম এমন কথা বলতেন না। বরং তারা বলতেন এটা আমার কাছে অপছন্দনীয় আর ওটা পছন্দনীয়। আর হালাল ও হারাম শব্দ প্রয়োগকে তারা আল্লাহ্‌র ওপর মিথ্যারোপ বলে মনে করতেন। আপনারা কি আল্লাহ তা'আলার এ বক্তব্য শুনেননি ঃ

قُلْ اَرَءَيْتُمْ مَّآ اَنْزَلَ اللّٰهُ لَكُمْ مِّنْ رِّزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِّنْهُ حَرَامًا وَّحَلٰلًا ط قُلْ اٰللّٰهُ اَذِنَ لَكُمْ اَمْ عَلَى اللّٰهِ تَفْتَرُوْنَ

বলো, নিজেই লক্ষ্য করে দেখো যা কিছু আল্লাহ তোমাদের জন্য রিযিক হিসেবে অবতীর্ণ করেছেন তোমরা সেগুলোর মধ্য থেকে কোনটাকে হারাম আর কোনটাকে হালাল সাব্যস্ত করেছ ? বলো তোমাদের কি আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন না কি তোমরা আল্লাহ্‌র ওপর অপবাদ আরোপ করছ ?

(সূরা ইউনুস ঃ ৫৯)

ইমাম শাফেয়ী তার 'কিতাবুল উম' এ ইমাম আবু হানীফার বিশেষ শিষ্য ইমাম আবু ইউসুফ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি আমাদের জ্ঞানী-গুনী ওলামা-মাশায়েখদের দেখেছি যে, তারা ফতোয়া দেয়ার সময় এটা হারাম এটা হালাল এমন কথা বলতে অপছন্দ করতেন। তবে যা আল্লাহ্‌র কিতাবে সুস্পষ্টভাবে আছে, কোনো ব্যাখ্যার অবকাশ রাখেনা, কেবল তাকেই হালাল ও হারাম বলতেন।

আমাকে (শাফেয়ীকে) ইবনে ছায়েব রাবী ইবনে হাইছাম থেকে বর্ণনা করেন যে, (তিনি ছিলেন শ্রেষ্ট তাবেয়ীদেরই একজন) তিনি বলেন, আল্লাহ্ এটা হালাল করেছেন বা পছন্দ করেন একথা যেন কেউ না বলে, যদি এরূপ বলেন তাহলে আল্লাহ তা'আলা বলতে পারেন আমি এটা হালাল করিনি আর পছন্দও করিনি। তেমনিভাবে কেউ যেন আল্লাহ এটা হারাম করেছেন এমন কথাও না বলে। যদি বলে তাহলে আল্লাহ বলতে পারেন তুমি মিথ্যা বলেছ। আমি এটা হারাম করিনি, এটা করতে নিষেধও করিনি।

আমাকে আমার জনৈক বন্ধু ইব্রাহীম নখায়ী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি তার বন্ধুদের কথা বলেছেন যে, তারা কোনো বিষয়ে ফতোয়া দিলে অথবা কোনো বিষয়ে নিষেধ করলে তখন বলত এটা মাকরুহ (অপছন্দনীয়) আর এটা করা যেতে পারে। তাছাড়া এটা হালাল ওটা হারাম এমন কথা বলা অত্যন্ত কঠিন।

দৃশ্যমান নান্দনিক শিল্প

(চিত্রাংকন শিল্প, ফটো ও কারুকার্য)

আল-কুরআনে চিত্রাংকন প্রসঙ্গ

আল-কুরআন চিত্রাংকন প্রসঙ্গে বলে এটা আল্লাহ তা'আলারই একটা কর্ম। তিনিই চমৎকার চিত্রকর্ম সৃষ্টি করেন, বিশেষত প্রাণী জগতের। তার প্রথম সারীতে রয়েছেন মানব জাতি।

هُوَالَّذِىْ يُصَوِّرُكُمْ فِى الْاَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ -

তিনিই তোমাদের মাতৃগর্ভে রূপ দান করেন যেমন চান তেমনি।

(সূরা আলে-ইমরান ঃ ৬)

وَصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ -

তিনিই তোমাদের রূপদান করেছেন, এবং তা উত্তম ভাবে করেছেন।

(সূরা তাগাবুন ঃ ৩)

اَلَّذِىْ خَلَقَكَ فَسَوّٰكَ فَعَدَ لَكَ - فِىْٓ اَىِّ صُوْرَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ -

তোমাকে সৃষ্টি করেছেন অতপর তোমাকে সুবিনস্ত করেছেন এবং সুষম করেছেন। তিনি তোমাকে তার ইচ্ছামত চিত্রে (আকৃতিতে) গঠন করেছেন।

(সূরা ইনফিতার ঃ ৭-৮)

আল-কুরআন আরও উল্লেখ করে যে, আল্লাহ তা'আলার একটি উত্তম নাম হলো 'মুছাব্বির'— চিত্রাংকনকারী। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন ঃ

هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى -

তিনি সেই আল্লাহ যিনি স্রষ্টা, উদ্ভাবক, রূপদাতা, উত্তম নামসমূহ তাঁরই।

(সূরা হাশর ঃ ২৪)

তেমনিভাবে আল-কুরআন ভাস্কর্য প্রসঙ্গে দুই স্থানে আলোচনা করেছেন।

প্রথম স্থানটি হলো ঃ নিন্দা ও সমালোচনা করে। আর তা করা হয়েছে ইব্রাহীম (আ) এর মুখ দিয়ে, যখন তার কাওমের লোকেরা ভাস্কর্য গুলোকে মূর্তিরূপে পূজাঁ করতে আরম্ভ করে। অর্থাৎ সেগুলোকে উপাস্য ও মাবুদ বনিয়ে নেয়। তাদের এ অপকর্মের সমালোচনা ও নিন্দা করে তিনি বলেন ঃ

مَا هٰذِهِ التَّمَاثِيْلُ الَّتِىْٓ اَنْتُمْ لَهَا عٰكِفُوْنَ - قَالُوْا وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا لَهَا عٰبِدِيْنَ -

এই মূর্তি গুলো কী ? যাদের তোমরা পূজারী হয়ে বসে আছে। তারা বলল আমরা আমাদের বাপ দাদাকে এদের পূজা করতে দেখেছি।

(সূরা আম্বিয়া ঃ ৫২-৫৩)

আর দ্বিতীয় স্থানটি হলো ঃ সোলাইমানের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দানের আলোচনা প্রসঙ্গে। বলা হয়, তিনি বাতাসকে তার অনুগামি করেছিলেন। আর জ্বিন জাতিকে তার অনুগত করে দিয়েছেন, তারা আল্লাহ্‌র অনুমোদনক্রমে তার সামনে তার জন্য কাজ করে যায় ঃ

يَعْمَلُوْنَ لَهٗ مَايَشَآءُ مِنْ مَّحَارِيْبَ وَتَمَاثِيْلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُوْرٍ رّٰسِيٰتٍ ط

اِعْمَلُوْٓا اٰلَ دَاوٗدَ شُكْرًا ط وَقَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِىَ الشَّكُوْرُ -

তারা তার ইচ্ছানুযায়ী দুর্গ ভাস্কর্য হাউস সদৃশ বৃহদকার পাত্র এবং চুল্লির ওপর স্থাপিত বিশাল ডেগ নির্মাণ করত। হে দাউদ পরিবার কৃতজ্ঞতা সহকারে তোমাদের কাজ করে যাও। আমার অল্প বান্দাই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। (সূরা সাবা ঃ ১৩)

আল-হাদীসে চিত্রাংকন প্রসঙ্গ

আর সুন্নাহতে চিত্রাংকন প্রসঙ্গটি বার বার এসেছে এবং অনেক গুলো সহীহ হাদীসে। প্রায় সবগুলো হাদীসে চিত্রাংকন ও রূপকারদের নিন্দা করা হয়েছে। কিছু কিছু হাদীসে চিত্রাংকনকে হারাম ঘোষণা করে এবং অংকনকারীদের ভিতি প্রদর্শন করে কঠোর ভাষায় নিন্দা করা হয়েছে। যেমন নিন্দা করা হয়েছে চিত্র সংগ্রহ এবং তা বাড়িতে টাঙ্গানোকে। আর ঘোষণা করা হয়েছে, যে বাড়িতে চিত্র বা ছবি থাকে সে বাড়িতে ফেরেশতারা প্রবেশ করে না।

আর ফেরেশতারা হলো আল্লাহ্‌র রহমত রবকত ও সন্তুষ্টির প্রতিক। তারাই যদি বাড়িতে প্রবেশ না করে তাহলে তার অর্থ দাঁড়ায়, সে বাড়ি আল্লাহ্‌র রহমত বরকত ও সন্তুষ্টি থেকে বঞ্চিত।

চিত্রাংকন ও চিত্র সংগ্রহ প্রসঙ্গে বর্ণিত হাদীস গুলোর দিকে অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে থাকলে সেসব হাদীসের প্রেক্ষাপট এবং পারিপর্শ্বিকতার দিকে দৃষ্টি দিলে এক হাদীসকে অপর হাদীসের সাথে মিলালে তখন সুস্পষ্ট হয় যে, এসব হাদীসে নিষিদ্ধ করণ হারাম ঘোষণা করণ এবং ভিতি প্রদর্শন উদ্দেশ্যহীন ও কাকতালীয় ভাবে ছিলনা। বরং এর পিছনে নানান কারণ ও উদ্দেশ্য বিদ্যমান ছিল যা শরিয়ত বাস্তবায়ন করতে চায়।

পূজনীয় ও সম্মানিত জিনিসের অংকন

ক. কিছু কিছু ছবি এমন আছে যা অংকন বা রূপায়ণের উদ্দেশ্য হলো তার সম্মান ও তাযীম করা। এ সম্মান প্রদর্শন বিভিন্ন রকমের হতে পারে। কখনো তা উৎসর্গ ও পূজা পর্যন্ত পৌঁছে। পৌত্তলিকতার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, প্রাথমিক পর্যায়ে তা ছিল স্মৃতি সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে, অতপর শেষ পর্যন্ত তা পূজা পর্যন্ত গড়ায়।

মুফাসিরগণ নূহ (আ)-এর কওমের মুখে আল্লাহ্‌র এ বাণীর ঃ وَقَالُوْا لَا تَذَرُنَّ اٰلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَّلَا سُوَاعًا لا وَّلَا يَغُوْثَ وَيَعُوْقَ وَنَسْرًا অর্থাৎ "তারা বলে তোমরা তোমাদের উপাস্যদের ছেড়ে দিওনা, ত্যাগ করোনা এবং ত্যাগ করোনা ওয়াদ, সুয়া ইয়াগুছ ইয়াউক নছরকে।"[১] ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, এসব মূর্তি মূলত কিছু নেককার লোকের নাম ও আকৃতিতে তৈরী। এসব লোক মারা গেলে শয়তান তাদেরকে বুদ্ধি যোগায় যে, তারা যেসব স্থানে বসত সেখানে তোমরা তাদের স্মৃতি রক্ষার্থে তাদের ভাস্কর্য স্থাপন করো। এবং ভাস্কর্যগুলো তাদের নামেই নামকরণ করো। তখন তারা তাই করল। অবশ্য এসব ভাস্কর্যের পূজা তখনও তারা করেনি। ভাস্কর্য তৈরী কারীরা যখন মারা গেল আর জনগণ তাদের উদ্দেশ্যের কথা ভুলে গেল তখন তাদের পূজা আরম্ভ হলো।

হযরত আয়শা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) যখন অসুস্থ হলেন তখন তার জনৈক স্ত্রী মারিয়া নামক এক গির্জার কথা আলোচনা করলেন। উম্মে সালামা ও উম্মে হাবীবা আবিসিনিয়া গিয়েছিলেন। তাই তারা দুজনেই সেই গির্জার সৌন্দর্য ও তার ছবি গুলোর কথা আলোচনা করল। এমতাবস্থায় রাসূল (স) তার মাথা তুললেন এবং বললেন, "(ওদের কোনো নেককার লোক যখন মারা যায় তখন তারা তার কবরের ওপর মসজিদ (উপাসনালয়) বানায়। অতপর তার ওপর এসব ছবি অংকন করে। তারাই হলো আল্লাহ্‌র নিকৃষ্টতম সৃষ্টি।"[২]

একথা শতসিদ্ধ যে, ছবি ও ভাস্কর্য পৌত্তলিকতার ছায়াতলেই বেশি বিকশিত হয়। যেমন তা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর কওমে প্রাচীন মিসর, গ্রীক, রোমানদের মধ্যে এবং এখনও পর্যন্ত হিন্দুদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়।

আর খ্রিস্টান ধর্ম রোম সম্রাট কনস্ট্যান্টিনোপলের হাতে যখন পড়ে তখন তাতে গ্রীকদের অনেক পৌত্তলিকতা ঢুকে পড়ে। সম্ভবত ছবি অংকনের প্রতি যে তীব্র বর্ৎসনা এসেছে তা ঐ সব লোকদের ব্যাপারে যারা মিথ্যা বানোয়াট

---

১. সূরা নূহ : ২৩

১. বুখারী ইত্যাদিতে ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত।
২. বুখারী, মুসলিম।

'ইলাহ' বা উপাস্য বানায়। এবং ঐসব জাতি সম্বন্ধে যারা বিভিন্ন উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে। যেমন ইবনে মাসউদ থেকে মারফু সনদে বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীসটি— "আল্লাহ্‌র কাছে সবচেয়ে কঠোর শাস্তির সম্মুখীন হবে ছবি অংকনকরীরা।[১]"

ইমাম নববী বলেন, বলা হয় এ হাদীসটি ওদের ওপর আরোপিত যারা পূজাকরার উদ্দেশ্যে ছবি ও মূর্তি বানায়। যারা এরূপ করে তারা কাফের আর তারাই হবে কঠোর শাস্তির সম্মুখীন। আর কারো কারো মতে এ শাস্তি ঐ সব লোকদের ওপর আরোপিত যারা ছবি অংকন ও মূর্তি নির্মাণের মাধ্যমে সৃষ্টি কর্মে আল্লাহ্‌র সমকক্ষ হতে চায়। আর যারা এর মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সমকক্ষ হয় বলে বিশ্বাস করে তারা কাফের। তারা অবশ্যই কঠোর শাস্তির সম্মুখীন হবে যা কাফেরদের জন্য নির্ধারিত। তাদের শাস্তি আরো তীব্রতর ও বিবৎস হবে যেহেতু তাদের কুফরী বিবৎস।[২]

ইমাম নববীর একথা উল্লেখ করার কারণ হলো— অথচ তিনি ছবি অংকন হারাম গণ্যকারীদের মধ্যে অত্যন্ত কঠোর— তিনি একথা কল্পনাই করতে পারছিলেন না যে, শরীয়তের মূল উদ্দেশ্যের আলোকে একজন সাধারণ চিত্রকর খুনী, ব্যবিচারী, মদ্যপায়ী, সুদখোর, মিথ্যা সাক্ষ্য দাতা ইত্যাদি কবীরা গুনাহ কারীদের চেয়ে বেশি কঠোর শাস্তির সম্মুখীন হবে।

একবার মাছরুক এক বাড়িতে প্রবেশ করেন, তখন তিনি সেখানে একটা ছবি দেখতে পান। তখন তিনি বাড়িওয়ালাকে জিজ্ঞেস করেন, এ ছবি কি কিসরার? তখন বাড়িওয়ালা বলেন, না, এটা মরিয়ম (আ)-এর ছবি। তখন মাছরুক ইবনে মাসউদের উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেন। (এ থেকেও ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, যারা পূজা ও উপাসনার উদ্দেশ্যে ছবি অংকন করে তারাই সবচেয়ে বেশি কঠোর শাস্তির সম্মুখীন হবে)।

অন্য ধর্মের প্রতিক পরিচায়ক বিষয়ের ছবি অংকন করা

খ. উক্ত ধরনের ছবির কাছাকাছি আর এক ধরনের ছবি হলো ইসলাম ছাড়া অপর কোনো ধর্মের ধর্মীয় প্রতিকের ছবি অংকন। এর উত্তম উদাহরণ হলো খ্রিস্টানদের "ক্রুশ"-এর ছবি অংকন। কাজেই যে ছবিতে ক্রুশ থাকবে তা অংকন করা নিঃসন্দেহে হারাম। মুসলমানকে তা অবশ্যই ছিড়ে ফেলতে বা ভেঙ্গে ফেলতে হবে।

---

১. বুখারী মুসলিম।

২. নববী, শারহু মুসলিম ১৪/৯১।

এ প্রসঙ্গে ইমাম বুখারী হযরত আয়শা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল করীম (স) তাঁর বাড়িতে এমন কিছু না ভেঙ্গে রাখতেন না যাতে ক্রুশের ছবি আছে।

আল্লাহ্র সৃষ্টির সমকক্ষ তৈরী করা

গ. আল্লাহ্র সৃষ্টির সমকক্ষ তৈরী করা। অর্থাৎ এমন দাবি করা যে, আল্লাহ যেমন সৃষ্টি করেন তেমনি চিত্রকরও সৃষ্টি করে। মনে হয় এ বিষয়টি চিত্রকরের উদ্দেশ্য ও নিয়তের সাথে সম্পর্কিত। অবশ্য কিছু কিছু লোক মনে করে যে, প্রত্যেক চিত্রকরই আল্লাহ্র সৃষ্টির সাথে সমকক্ষ তৈরী করে।

এ প্রসঙ্গে হযরত আয়শা (রা) কর্তৃক রাসূল (স) থেকে বর্ণিত একটি হাদীস হলো, "কিয়ামত দিবসে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হবে ওরা যারা সৃষ্টিতে আল্লাহ্র সমকক্ষ হতে চায়।[১]

এই কঠোর হুমকি ইঙ্গিত করে যে, তারা আসলেই সৃষ্টিকর্মে আল্লাহ্র সমকক্ষ হওয়ার ইচ্ছা করে। ইমাম নববী একথাই উল্লেখ করেছেন মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থে। এরূপ ইচ্ছা কাফের ছাড়া আর কেউ করতে পারে না।

উপরোক্ত বক্তব্য সমর্থন ও প্রমাণ করে আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত নিম্নোক্ত সহীহ হাদীসটি। তিনি বলেন, আমি রাসূল (স)-কে একথা বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন, তাদের চেয়ে বড় জালিম কে যারা আমার সৃষ্টির মতো সৃষ্টি করতে চায়। তারা তাহলে একটা অনুসৃষ্টি করুক। একটি শস্য দানা বা একটা জবের দানা সৃষ্টি করুক।[২] এ হাদীসের ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي —'যারা আমার সৃষ্টির মতো সৃষ্টি করতে চায়' বাক্যটি সৃষ্টির আকাংক্ষা প্রমাণ করে। এ কারণেই সম্ভবত কিয়ামত দিবসে তাদের সামনে আসবে আল্লাহ তা'আলার এ চ্যালেঞ্জ, "তোমরা যা সৃষ্টি করেছ তাতে জীবন দান করো— নিঃসন্দেহে এ আহবানে সাড়া দান তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। কাজেই তা হবে তাদেরকে দুর্বল করার (কৌশলী) আহবান। যেমন উসুল বিদরা বলে থাকেন।

'ছবি বিলাসিতার অন্তর্ভুক্ত'

ঘ. বিলাসিতার অন্তর্ভুক্ত ও তার প্রতিক হওয়া। নবী করীম (স) বাড়িতে কিছু ছবি দেখে তাকে অপছন্দ করা থেকে প্রমাণীত হয় যে, তা বিলাসিতার

১. বুখারী, মুসলিম।
২. বুখারী, মুসলিম।

অন্তর্ভুক্ত। আয়শা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল (স) একবার এক যুদ্ধে বের হলেন, তখন আমি একটা পর্দা কিনলাম এবং তার দ্বারা দরজা ঢাকলাম। তিনি যখন ফিরে আসলেন তখন পর্দাটি নিয়ে ছিড়ে ফেললেন, তারপর বললেন, "আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে মাটি ও পাথরকে কাপড় পরাতে আদেশ করেননি। তিনি বলেন, অতপর তা দিয়ে আমরা দুটি বালিশ বানালাম, তার অভ্যন্তরে আশঁ ঢুকালাম। তিনি আমাদের এ কাজের সমালোচনা করেননি।[১]

'আল্লাহ আমাদেরকে আদেশ করেননি' —এ বক্তব্য হতে বুঝা যায় যে, পর্দা টাঙ্গানো ফরয ওয়াজিব কিছু নয়। এ বাক্য এর চেয়ে বেশি কিছু বুঝায় না যে, তা কেবল মাকরুহে তানযীহি। যেমন ইমাম নববী বলেছেন। তবে নবীর বাড়ি মানুষের জন্য আদর্শ বাড়ি হওয়া চাই, যাতে থাকবেনা দুনিয়ার কোনো বিলাসিতা ও চাকচিক্য।

এ বক্তব্যকে আরও জোরালো করে আয়শা (রা)-এর অপর একটা হাদীস। তিনি বলেন, আমাদের একটা পর্দা ছিল, সে পর্দায় পাখির ছবি ছিল। কোনো আগন্তুক যখন বাড়ি প্রবেশ করত তখন তা তার সামনে পড়ত। তখন রাসূল (স) আমাকে বললেন, এটা উল্টে দাও। কারণ যতবারই আমি প্রবেশ করেছি এবং তা দেখেছি ততবারই আমার দুনিয়ার কথা মনে হয়েছে।[২]

অনুরূপ আর একটি হাদীস হলো যা কাসেম ইবনে মুহাম্মদ হযরত আয়শা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তার একটা কাপড় ছিল যাতে ছবি ছিল। যা একটি থাকের ওপর টাঙ্গানো ছিল, নবী করীম (স) সে দিকেই নামায আদায় করতেন। একবার তিনি বললেন, এটা আমার সামনে থেকে সরিয়ে দাও। তখন তা আমি সারিয়ে দিলাম এবং তা দিয়ে বালিশ তৈরী করলাম।

মুসলিম ছাড়া অপর গ্রন্থের এক বর্ণনায় আছে, এটা আমার সামনে থেকে সরিয়ে দাও। কারণ এর ছবিগুলো আমার নামাযে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়।[৩]

এসব অতিরিক্ত বিলাসিতা ও চাকচিক্য মাকরূহ পর্যায়ের কাজ, হারাম পর্যায়ের কাজ নয়। তবে ইমাম নববী বলেন, এ হাদীস ছবি ব্যবহার হারাম হবার পূর্বের বলে ধারণা করা হয়। কারণ রাসূল (স) বড়িতে এসে তা দেখতেন কিন্তু তা ব্যবহার করতে নিষেধ করতেন না।

এ বক্তব্যের তাৎপর্য হলো যেসব হাদীস থেকে সুস্পষ্ট ভাবে ছবি অংকন ও ব্যবহার হারাম বুঝায় তা এ হাদীস ও এ জাতীয় হাদীস গুলোকে রহিত করেছে,

---

১. বুখারী, মুসলিম
২. মুসলিম কর্তৃক, ছবি ব্যবহার হারাম অধ্যায় বর্ণিত।
৩. মুসলিম, নববীর ব্যাখ্যা, খ. ১৪ খ. ৭৮।

তবে সম্ভাবনা ও আন্দাজ অনুমানের ওপর ভিত্তি করে রহিত প্রমাণ করা যায় না। রহিত প্রমাণ করার জন্য দুটি বিষয় পরিজ্ঞাত হওয়া আবশ্যক।

এক ঃ দুটি হাদীস পরস্পর বিরোধী, এতদুভয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন সম্ভব নয় তা প্রমাণ হতে হবে। অথচ ছবি সংক্রান্ত হাদীস গুলোর মধ্যে সমন্বয় সামাধান সম্ভব। হারাম সাব্যস্তকারী হাদীসগুলোকে সৃষ্টি কর্মে আল্লাহ্‌র সমকক্ষতার্জন ইচ্ছুকদের কিংবা তা মূর্ত ছবির (মূর্তির) ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে সাব্যস্ত করে।

দুই ঃ দুই নসের মধ্যে কোনটি শেষের তা জানতে হবে। ছবি অংকন ও ব্যবহার হারাম প্রমাণকারী হাদীসগুলো শেষের তার কোনো প্রমাণ নেই। বরং ইমাম তাহাবীর দৃষ্টিতে তার 'মাশ্‌কিলুল আছাব' গ্রন্থে উল্লেখিত বক্তব্যানুযায়ী ব্যাপারটি তার বিপরীত। তার মতে ইসলাম প্রাথমিক পর্যায়ে ছবির ব্যাপারে কঠোরতা আরোপ করে, কারণ সময়টা ছিল তখন পৌত্তলিকতার কাছাকাছি। অতপর যেসব ছবি রেখার মাধ্যমে অংকন করা হয় অর্থাৎ যা কাপড়ে ইত্যাদিতে অংকন করা হয় তার ব্যাপারে কিছুটা ছাড় দেয়া হয়।

এ হাদীসটি হযরত আয়শা (রা) থেকে অন্য ভাষায়ও বর্ণিত হয়, যা থেকে নবী করীম (স) তাকে অত্যন্ত অপছন্দ করেছিলেন বলে প্রমাণ হয়।

হযরত আয়শা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি একটা বালিশ কিনলেন, তাতে কিছু ছবি ছিল। রাসূল করীম (স) তা যখন দেখলেন তখন দরজায় দাড়িয়ে গেলেন, বাড়িতে প্রবেশ করলেন না। তখন আমি তার মুখ দেখেই তাঁর অপছন্দের বিষয়টি বুঝতে পারলাম। তিনি বলেন, তখন আমি বললাম, হে আল্লাহ, আল্লাহর কাছে পানাহ (আশ্রয়) চাই, তার রাসূলের কাছেও পানাহ চাই। আমি কি অপরাধ করলাম ? তখন তিনি বললেন, এ বালিশ কিসের, আমি বললাম এটা আপনার বসার জন্য এবং বিশ্রামের জন্য কিনেছি, তখন রাসূল (স) বললেন, এ ছবির চিত্রকরদের কিয়ামত দিবসে শাস্তি দেয়া হবে। তাদেরকে বলা হবে, তোমরা যা সৃষ্টি করেছ, তা জীবিত করো। তিনি আরও বলেন, যে বাড়িতে ছবি থাকে সে বাড়িতে ফেরেশতারা প্রবেশ করে না।[১]

হাদীসের তাৎপর্য অনুধাবনের প্রতি দৃষ্টিপাত

চিত্র অংকন ও ছবিকে কেন্দ্র করে যে পরিবেশ পরিস্থিতি বিরাজমান ছিল সে পরিবেশ পরিস্থিতির ওপর ভিত্তি করেই হারাম প্রমাণকারী হাদীসগুলো প্রায় ব্যক্ত হয়েছে। কাজেই এ বিষয়ে যদি কোনো কঠোরতা আরোপ করা হয়ে থাকে

---

১. বুখারী মুসলিম।

তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। যদিও ছবি বা চিত্র অংকনের প্রতি তাতে যে কঠোরতা আরোপ করা হয়েছে তা ছবি সংগ্রহ ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে আরোপ করা হয়নি। যে সব ছবি অংকন করা হারাম (নিষিদ্ধ) তার অনেক কিছুই বিছানা বালিশ ইত্যাদি দৈনন্দি জীবনের ব্যবহার্যের মতো তুচ্ছ জিনিসে ব্যবহার করা বৈধ, যেমন তা আয়শা (রা)-এর হাদীসে দেখা যায়।

ছবি অংকন হারাম হওয়া প্রসঙ্গে যে কঠোর হাদীসটি ইবনে আব্বাস হতে বুখারী-মুসলিমে মারফু সনদে বর্ণিত হয়েছে তাহলো সব চিত্রকরই জাহান্নামী হবে, তারা যে সব ছবি অংকন করেছে তার বিপরীতে একটা প্রাণী সৃষ্টি করা হবে, সে প্রাণী তাকে জাহান্নামে শাস্তি দেবে।

বুখারীর এক বর্ণনায় সাঈদ ইবনে আবুল হাসান থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, আমি ইবনে আব্বাস এর কাছে ছিলাম তখন এক লোক আসলেন, তারপর বলেন, হে ইবনে আব্বাস! আমি নিজ হাতে উপার্জন করে জীবন যাপন করি। আমি এই মূর্তিগুলো বানাই। তখন ইবনে আব্বাস বলেন, আমি রাসূল (স) থেকে যা শুনেছি তোমাকে তাই বলব, আমি তাকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি চিত্রাংকন করে আল্লাহ তা'আলা তাকে শাস্তি দেবেন, যতক্ষণ না তাতে প্রাণ দান করবে। সে তাতে কখনো প্রাণ দান করতে পারবে না। তখন লোকটি রাগে ক্ষেপে ফুলতে আরম্ভ করল। তখন ইবনে আব্বাস বললেন, তোমার সর্বনাশ হোক, তুমি যদি ছবি বানাতেই চাও তাহলে এসব গাছ-গাছালী এবং যেসব জিনিসের প্রাণ নাই তার ছবি বানাতে পার।

ইমাম মুসলিম হাব্বান ইবনে হোসাইন থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমাকে আলী ইবনে আবি তালিব (রা) বলেছেন, রাসূল (স) আমাকে যে কাজে পাঠিয়েছিলেন আমি কি তোমাকে সে কাজের জন্য পাঠাব না ? যত ছবি বা মূর্তি পাও ভেঙ্গে দেবে আর যত উঁচু কবর পাবে তা মাটির সাথে মিশিয়ে দেবে।

ইমাম মুসলিম হযরত আয়শা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, জিবরাঈল (আ) রাসূল (স)-এর সাথে ওয়াদা করেছিলেন যে, তিনি একটা নির্দিষ্ট সময় আসবেন। অতপর সে সময় আসল কিন্তু রাসূলের কাছে তিনি আসলেন না। তখন রাসূলের হাতে একটা লাঠি ছিল। রাসূল (স) লাঠিটি হাত থেকে ফেলে দিলেন এবং বললেন, আল্লাহ ও তাঁর প্রতিনিধিরা তো ওয়াদা খেলাফ করেন না। অতপর এদিক সেদিক তাকিয়ে দেখলেন যে, তার খাটের নিচে একটি কুকুরের বাচ্চা। তখন বললেন, হে আয়শা এ বাচ্চাটি এখানে কবে ঢুকেছে ? তখন তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র কছম আমি কিছুই জানিনা। অতপর

তিনি তা বের করে দেয়ার নির্দেশ দিলে বের করে দেয়া হলো। অতপর জিবরাঈল (আ) আসলেন। তখন রাসূল (স) বললেন, আপনি আমার সাথে ওয়াদা করেছিলেন আসবেন, আমিও আপনার জন্য অপেক্ষা করেছিলাম কিন্তু আসলেন না। তখন জিবরাঈল (আ) বলেন, আপনার বাড়িতে যে কুকুরটি ছিল তা বাড়িতে প্রবেশ করা থেকে আমাকে বিরত রেখেছে। কারণ যে বাড়িতে কুকুর ও ছবি আছে আমরা সে বাড়িতে প্রবেশ করি না।[১]

উপরোক্ত বর্ণনাগুলো থেকে আমরা জানতে পারলাম যে, ছবি অংকন ও ছবি প্রসঙ্গে যেসব হাদীস বর্ণিত হয়েছে তার সংখ্যা কম নয়। যেমনটি মনে করেছেন এ বিষয়ে কোনো কোনো আলোচক, এসব হাদীস একদল সাহাবী বর্ণনা করেছেন। তাদের মধ্যে আছেন, ইবনে মাসউদ, ইবনে ওমর, ইবনে আব্বাস, আয়শা, আলী, আবু হুরায়রা আবু তালহা (রা) প্রমুখ। এবং সবগুলো হাদীসই সহীহ গ্রন্থ গুলোতে বর্ণিত।

এসব হাদীসের ভিত্তিতে ছবি প্রসঙ্গে ফকীহদের অভিমত বিভিন্ন রকম রয়েছে। এদের মধ্যে কঠোর অভিমত গ্রহণ করেছিলেন ইমাম নববী। তিনি যেসব ছবি কোনো মানুষ বা প্রাণীর তা সবই হারাম বলে অভিমত দিয়েছেন। তা মূর্ত হোক বা বিমূর্ত। অসম্মানের হোক বা সম্মানের। তবে তিনি অসম্মানের ছবি ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছেন। যদিও তা তৈরী করা হারাম। যেমন ছবি সম্বলিত বালিশ, বিছানার চাদর ইত্যাদি।

তবে ছালফে সালেহীনদের কিছু ফকিহর অভিমত হলো, কেবল মূর্ত ছবিই তৈরী করা ও ব্যবহার করা হারাম। মূর্ত ছবি হলো সে ছবি যাকে মূর্তি বলা হয়। এ ছবি পৌত্তলিকতার সাথে খুব সাদৃশ্যমান। এ ধরনের ছবিতেই আল্লাহ্র সাথে সৃষ্টিকর্মে সমকক্ষতা অর্জনের ইচ্ছা প্রকাশ পায়। কারণ আল্লাহ্র সৃষ্টি ও তার চিত্রিত বিষয়গুলো মূর্ত বা শরীরি।

هُوَ الَّذِىْ يُصَوِّرُكُمْ فِى الْاَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ -

তিনিই আমাদেরকে রূপদান করে মায়ের গর্ভে যেমন ইচ্ছা তেমন।[২]

আর হাদীসে কুদসীতে আছে 'তার চেয়ে বড় জালিম কে হতে পারে যে আমার সৃষ্টির মতো সৃষ্টি করতে চায়।' আল্লাহ সৃষ্টিগুলো মূর্ত। তাতেই কেবল প্রাণ সঞ্চার করা সম্ভব। কারণ অংকিত ছবিতে প্রাণ দান সম্ভব নয়। তাছাড়া তা বিলাস দ্রব্য ও অপচয়ের অন্তর্ভুক্ত। বিশেষত যা মূল্যবান ধাতব দ্রব্য দ্বারা তৈরী।

---

১. মুসলিম।

২. সূরা আলে-ইমরান ঃ ৬

এটাই হলো কোনো কোনো সালাফের মাযহাব বা অভিমত।

ইমাম নববী বলেন, এ মাযহাবটি বতিল। হাফেয ইবনে হাজর তার একথার প্রতিবাদ করে বলেন, এ মাযহাবটি কাসেম ইবনে মুহাম্মদের। সম্ভবত তিনি এ অভিমতটি রাসূল (স)-এর "তবে যা কাপড়ে ছাপানো হয় বা অংকিত হয় (তা অংকন করা যায়) উক্তির ওপর ভিত্তি করেই গ্রহণ করেছেন, আমরা হাদীসটি সামনে আলোচনা করব।

কাসেম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর হলেন মদীনার সাত ফকীহর একজন। এবং যুগের শ্রেষ্ট জ্ঞানীদেরই একজন। তিনি ছিলে হযরত আয়শা (রা)-এর ভাতিজা। আর আয়শা (রা) থেকে পর্দা সংক্রান্ত হাদীসটির রাবী। আর উপরোক্ত অভিমতের পক্ষে নিম্নোক্ত হাদীসটিও পেশ করা যায়।

সহীহ হাদীস গ্রন্থে বুছার ইবনে সাঈদ থেকে তিনি সাইদ ইবনে খালেদ আল জাহানী থেকে তিনি রাসূল (স)-এর সাহাবী আবু তালহা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, "যে বাড়িতে ছবি থাকে সে বাড়িতে ফেরেশতারা প্রবেশ করেন না।" বুছার বলেন, অতপর সাইদ অসুস্থ হয়ে পড়েন, তখন আমরা তাকে দেখতে গেলাম, তখন দেখলাম তার বাড়ির দরজায় একটা ছবি সম্বলিত পর্দা। তখন আমি রাসূল (স)-এর স্ত্রী মাইমুনার পালিত পুত্র ওবায়দুল্লাহ আল খাত্তলানীকে বললাম, আমাদেরকে কি সাইদ গত কালকে ছবি সম্পর্কে হাদীস বর্ণনা করেনি ? তখন তিনি বললেন, যখন তিনি হাদীস বলেছিলেন তখন কি বলেছিলেন তা শুনেননি ? তিনি বলেছিলেন, "তবে কাপড়ে ছাপানো ছবি ব্যতীত।"

তিরমিযী শরীফে ছাহাল ইবনে হোনাইফ থেকে বর্ণিত হাদীসটি এ বক্তব্যকে আরও জোরালো করে। সে হাদীসে দেখা যায় যে, আবু তালহা "তবে কাপড়ে ছাপানো ছবি ব্যতীত" বক্তব্যটি সমর্থন করেছেন।

এর তাৎপর্য হলো যেসব ছবি অপ্রাণীদের তা অংকন করা যায়। তবে এ বক্তব্যটি আয়শার বাড়িতে পাখির ছবি সম্বলিত একটা পর্দা ছিল এবং নবী (স) সে সম্পর্কে বলেছিলেন, "এটা সরিয়ে ফেল কারণ যখন এটা দেখি দুনিয়ার কথা স্মরণ হয় অথবা এর ছবিগুলো আমার নামাযে বিঘ্ন সৃষ্টি করে" হাদীসটির বিপরীত।

অধিক অগ্রাধিকার প্রাপ্য অভিমত হলো, কেবল মূর্ত ছবি অর্থাৎ মূর্তি তৈরী ও ব্যবহার হারাম হওয়া, আর পেপারে কিংবা দেয়ালে বা বোর্ড ইত্যাদিতে অংকিত ছবি বেশির পক্ষে মাকরুহে তানযীহি হতে পারে। যেমন ইমাম খাত্তাবী

বলেছেন, তবে যদি তাতে বাড়াবাড়ি করা হয় কিংবা অপচয় করা হয়— যেমন যেসব ছবি মিলিয়ন মিলিয়ন টাকার বিনিময়ে বিক্রি হয়— তবে তা হবে ব্যতিক্রম (হারাম)।

তবে মূর্ত হারাম ছবির মধ্যে শিশুদের খেলার পুতুল কুকুর বিড়াল বানর বরকনে ইত্যাদি যা কিনা খেলার সামগ্রী হয়ে থাকে তাকে অবশ্যই ব্যতিক্রম গণ্য করতে হবে। কারণ তাকে কেউ সম্মান করে না শিশুরা তা নিয়ে খেলাই করে।

এর প্রমাণ হলো হযরত আয়শা (রা)-এর হাদীসটি। তাতে বলা হয়েছে যে, তিনি নিজে পুতুল নিয়ে খেলতেন, তাঁর কিছু বান্দবী আসত তারাও তা নিয়ে তার সাথে খেলত, রাসূল (স) তাঁর খেলার সাথীরা আসলে খুশি হতেন।

এ ধরনের আর এক প্রকারের ছবি হলো যা হালুয়া ইত্যাদি দ্বারা বর-কনের আকৃতিতে তৈরী করা হয় এবং বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষ্যে বিক্রি করা হয়, অতপর তা খেয়ে ফেলা হয় (তাও ব্যতিক্রম)।

অনুরূপভাবে নিষিদ্ধ হতে ব্যতিক্রম গণ্য হয় সেসব মূর্ত ছবিও যার মাথা ইত্যাদি কর্তন করে বিকৃত করা হয়। যেমন হাদীস আছে যে, জিবরাঈল (আ) রাসূল (স)-কে বলেছিলেন, "বলো মূর্তিটার মাথা কেটে ফেলতে যাতে তা গাছের মতো হয়ে পড়ে।"

তবে বিভিন্ন মাঠ ও পার্ক ইত্যাদিতে রাজা-বাদশা ও নেতা-নেত্রীর সেসব অর্ধ ভাস্কর্য নির্মাণ করা হয় তা অবশ্যই হারামের গণ্ডি থেকে বের হবে না। কারণ তারও সম্মান করা হয়।

জাতীয় নেতা ও বীরদের স্মৃতি রক্ষার ইসলামী নীতি পশ্চিমাদের নীতির বিপরীত। ইসলাম তাদেরকে চিরস্থায়ী করে রাখতে চায় তাদের মহান কির্তি ও উত্তম জীবনাদর্শের আলোচনার মাধ্যমে যা এক প্রজন্ম হতে অপর প্রজন্ম আলোচনা করবে, অনুসরণ করবে এবং তাদের আদর্শে আদর্শিত হবে। এভাবেই ইসলাম নবী রাসূল সাহাবী তাবেয়ী আইম্মায়ে মুজতাহেদীন জাতীয় বীর ও আল্লাহ্ ওয়ালা মণীষীদের চির স্মরণীয় করে নিয়েছে। ফলে মানুষ অন্তর থেকে তাদের ভালোবাসতে আরম্ভ করেছে এবং তাদের জন্য আন্তরিক ভাবে দো'আ করছে। তাদের কোনো মূর্তি স্থাপন করেনি আর না কোনো ভাস্কর্য নির্মাণ করেছে।

এমনও অনেক মূর্তি আছে যার সম্পর্কে মানুষ কিছুই জানেনা, যেমন কায়রো শহরের মধ্যেই নির্মিত 'লাজুগুলী' মূর্তির কথা। এমনও অনেক মূর্তি আছে যার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় মানুষ তার বর্ৎসনা করে।[১]

---

১. দেখুন আমার 'ইসলামে হালাল হারাম' গ্রন্থে ছবি সম্পকির্ত আলোচনা।

ফটোগ্রাফী

কারো কাছে অজানা নয় যে, ছবি তৈরী ও ছবির ব্যবহার সম্পর্কে যেসব হাদীস বর্ণিত হয়েছে তা থেকে বুঝানো হয়েছে সেসব ছবি যা খোদাই করে বা ভাস্কর্য আকৃতিতে কিংবা অংকন করে বানানো হয়।

তাছাড়া আলোক চিত্র যা ক্যামেরার মাধ্যমে তোলা হয়, তা এক নতুন জিনিস যা রাসূলের যুগে ছিলনা। অতীত মুসলমানদের আমলেও ছিলনা। অতএব ছবি তৈরী ও ব্যবহার এবং চিত্রকরদের সম্পর্কে যেসব হাদীস বর্ণিত হয়েছে তা কি আলোক চিত্র ও ফটোর ওপর আরোপ করা যায়?

যারা কেবল মূর্ত ছবি বা মূর্তি নির্মাণ হারাম মনে করেন তারা এসব ফটো ও আলোক চিত্র তোলায় ক্ষতিকর কিছু আছে বলে মনে করেন না। বিশেষত তা যদি অপরিপূর্ণ হয়।

আর অন্যান্যদের মতে ফটোগ্রাফিকে কি চিত্রকরদের রং তুলি দ্বারা অংকিত ছবির সাথে কিয়াস করা যায়? নাকি কোনো কোনো হাদীসে চিত্রকরদের শাস্তিদানের কারণ হিসেবে যা উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন তারা সৃষ্টি কর্মে আল্লাহ্‌র সমকক্ষতা অর্জনের ইচ্ছা করে, তা আলোক চিত্রে ও ফটোতে পাওয়া যায় না? আর যদি কারণ পাওয়া না গিয়ে থাকে তাহলে হুকুমও পাওয়া যাবেনা, যেমনটি উসুলবিদরা বলে থাকেন।

এখানে মিসরের গ্রেন্ট মুফতী শেখ বুখাইত এ প্রসঙ্গে যে, ফতোয়া দিয়েছেন তা প্রনিধানযোগ্য। তিনি ফতোয়া দেন যে, আলোক চিত্র বা ফটো হচ্ছে আসলে– এ বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের মতে— বিশেষ এক যন্ত্রের মাধ্যমে ছায়াকে স্থায়ী করা, যা নিষিদ্ধ ছবির অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ নিষিদ্ধ ছবি হচ্ছে এমন ছবি তৈরী ও সৃষ্টি করা যা পূর্ব থেকে তৈরী ছিলনা, যার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র কর্তৃক সৃষ্ট কোনো প্রাণীর সমকক্ষ বানাবার প্রয়াস চালানো হয়। আর ক্যমেরার মাধ্যমে ছবি তোলার ক্ষেত্রে এরূপ সমকক্ষতা অর্জনের অপপ্রয়াস হয় না। এ বক্তব্য আরও জোরালো হয় এ থেকেও যে, আরব উপদ্বীপের লোকেরা ফটোকে প্রতিবিম্ব বা আলোছায়া এবং ফটো উত্তলনকারীকে প্রতিবিম্ব তৈরীকারী বলে থাকেন।

এতদ্ব্যতীত এখানে আরও উল্লেখ করতে হয় যে, ছবির বিষয়বস্তুর একটা বড় প্রভাব আছে ছবি হারাম ইত্যাদি হবার ক্ষেত্রে। ইসলামী আকীদা বিশ্বাস মূল্যবোধ ও শরীয়তের বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক যে ছবি সে ছবি হারাম হবার ব্যপারে কোনো মুসলমান দ্বিমত করতে পারে না। কাজেই নারী দেহের নগ্ন ছবি

বা অর্ধনগ্ন ছবি কিংবা নারী দেহের নারীত্ব প্রকাশক অঙ্গগুলো উদ্ভাসিত করে ছবি তোলা কিংবা নারী অঙ্গের এমন ভঙ্গিতে ছবি অংকন করা যাতে দর্শকদের অন্তরে যৌন কামনা সৃষ্টি করে এবং যৌন ও কাম বৃত্তিকে জাগিয়ে দেয় যেমন কোনো কোনো সংবাদপত্র ম্যাগাজিন ও সিনেমা ইত্যাদিতে দেখা যায়, তা হারাম হবার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ সংশয় থাকতে পারে না। এ ধরনের ছবি তোলা, প্রকাশ ও প্রচার করা, সংগ্রহ করা, বাড়ি-ঘর ও অফিসে ব্যবহার করা, দেয়ালে টাঙ্গানো, তা দেখার ইচ্ছা করা সবই হারাম।

তেমনিভাবে জালিম ফাসিক কাফেরদের– যাদের আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে ঘৃণা করা মুমিনদের কর্তব্য— ছবি তৈরী করাও হারাম। সুতরাং যে নেতা নাস্তিক, আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব অস্বীকার করে কিংবা যে নেতা পৌত্তলিক, আল্লাহ্‌র সাথে শিরিক করে, অথবা যে লোক ইহুদী বা খ্রিস্টান মহানবীর নবুওয়াত অস্বীকার করে অথবা ইসলামের দাবিদার হয়েও আল্লাহ্‌র আইন ছাড়া মানব রচিত আইন মতে দেশ শাসন করে, কিংবা সমাজে আশ্লীতা নগ্নতা বেহায়াপনার বিকাশ ঘটায়। কোনো মুসলমানের জন্য এ জাতীয় নেতাদের ছবি তৈরী করা ও ব্যবহার করা বৈধ নয়।

তেমনিভাবে যেসব ছবি পৌত্তলিকাতা কিংবা অপর কোনো ধর্মের বিশেষের প্রতিক যা ইসলাম সমর্থন করে না যেমন মূর্তি, ক্রস ইত্যাদি তা তৈরী করাও হারাম।

চিত্র ও চিত্রকরদের বিধি বিধানের সারমর্ম

আমরা চিত্র ও চিত্রকরদের বিধানগুলো নিম্নের নিয়মে সংক্ষেপ করতে পারি.।

ক. সবচেয়ে বেশি হারাম চিত্র হলো সেসব চিত্র যাদের পূজা করা হয়। যেনেশুনে এজাতীয় চিত্র অংকন করা চিত্রাংকনকারীকে কুফরীর দিকে ধাবিত করে।

এ জাতীয় চিত্র যদি মূর্ত বা মূর্তিমান হয় তাহলে তা হারাম ও নিন্দনীয় হবার পরিমাণ আরও বেড়ে যায়। আর যারাই এ জাতীয় চিত্রের প্রচলন ও তাযীমে যে কোনো ভাবে সহযোগিতা করে তারা সকলেই সহযোগিতার পরিমাণ অনুযায়ী পাপী।

খ. গুনাহ ও পাপের দিক থেকে এর পরের স্তরে আসে সে সব ছবি যার পূজা করা নাহলেও তা তৈরীর উদ্দেশ্য সৃষ্টি কর্মে আল্লাহ্‌র সমকক্ষ হবার প্রয়াস। অর্থাৎ যে চিত্রাংকনের পশ্চাতে চিত্রকরের এমন দাবি থাকে যে, আল্লাহ্ যেমন সৃষ্টি করেন সেও তেমনি সৃষ্টি করতে পারে। চিত্রকর এর মাধ্যমে কুফরীর

কাছাকাছি চলে যায়। সন্দেহ নেই এ বিষয়টি চিত্রকরের নিয়তের ওপরেই কেবল নির্ভর করে।

গ. এর পরের স্তরে আসে অপূজনীয়দের মূর্ত বা মূর্তিমান চিত্র যদি তারা সম্মানীত ও মর্যাদাবান হয়। যেমন রাজা-বাদশাহ, নেতা-নেত্রী ইত্যাদির মূর্তি, যাদের স্মরণীয় করে রাখার জন্য তাদের মূর্তি তৈরী করা হয়। এবং তা দর্শনীয় স্থান, মাঠ, পার্ক ইত্যাদিতে স্থাপন করা হয়। এসব মূর্তি পূর্ণ হোক বা অর্ধেক হোক তাতে কোনো তফাত নেই।

ঘ. এর পরের স্থর হলো প্রাণীদের সেসব মূর্ত চিত্রের যার তাযীম বা সম্মান করা হয়না। এসব মূর্ত চিত্র হারাম হবার ব্যাপারে ঐকমত্য রয়েছে। তবে এদের মধ্যে যা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্ল করা হয় যথা শিশুদের খেলার পুতুল, মিষ্টান্ন ইত্যাদির তৈরী মূর্তি ইত্যাদি ব্যতিক্রম। (অর্থাৎ হারাম নয়)।

ঙ. এর পরের স্তরে আসে সম্মানীত লোকদের বির্মূত চিত্র (শিল্পকর্ম) যেমন নেতা-নেত্রীর চিত্র। বিশেষত তা যদি টাঙ্গানো হয় বা কোথাও স্থাপন করে রাখা হয়। এ জাতীয় ছবির স্থাপন ও টাঙ্গানো আরও বেশি হারাম হয় যদি তারা জালিম ফাসিক বা নাস্তিক হিসেবে পরিচিত হয়। কারণ এসব লোকদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ইসলামকে হেও ও ধ্বংস করার নামন্তর।

চ. এরপরের স্থর হলো প্রাণীর সে বিমূর্ত চিত্র যার সম্মান করা হয় না, তবে তা বিলাসিতার উপাদান হিসেবে চিহ্নিত হয়। তার দ্বারা দেয়াল ইত্যাদি ঢাকা হয়। এ জাতীয় চিত্রের ব্যবহার মাকরুহ বলে পরিগণিত।

ছ. এছাড়া অপ্রাণী তথা গাছ-পালা, নদী-নালা, সমুদ্র, পাহাড়-পবর্ত, জাহাজ-স্টিমার, আকাশ-নক্ষত্র ইত্যাদি প্রাকৃতি দৃশ্যের ছবি অংকন করা ও সংগ্রহ করা অবৈধ নয়, যদি তা এবাদত বান্দেগী থেকে বিমুখ না করে এবং বিলাসিতার পর্যায়ে না পড়ে। আর যদি তা হয় তাহলে তাও মাকরুহ বলে পরিগণিত হবে।

জ. আর ফটোগ্রাফী তা মূলত বৈধ। যদি ছবির বিষয়বস্তু হারাম বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত না হয়। যেমন তা ধর্মীয়ভাবে পূজনীয় ও দুনিয়াবী কারণে সম্মানিত না হয়, বিশেষত তা যদি ফাসেক ফাজের ও নাস্তিকদের ফটো না হয়। কামউনিস্ট, পৌত্তলিক ও বিকৃত মানসিকতার শিল্পিদের না হয়।

ঝ. শেষ কথা হলো, মূর্তি ও হারাম এবং মাকরু ছবি যদি বিকৃত করা হয়, কিংবা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ভাবে ব্যবহার করা হয় তখন তা হারাম ও মাকরুহর গণ্ডি থেকে বেরিয়ে হালালের গণ্ডিতে প্রবেশ করে। যেমন বেটসিট মেট ইত্যাদির ছবি যা পা ও জুতা ইত্যদি দিয়ে মাড়ানো হয়।

অপব্যাখ্যা

কিছু কিছু আলেম চিত্র তৈরী ও চিত্র সংগ্রহ সম্বন্ধে বর্ণিত সহীহ হাদীসগুলোর অপব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন, যাতে সব ধরনের ছবি এমন কি মূর্ত বা মূর্তিমান ছবিগুলোও বৈধ প্রমাণ করা যায়। যেমন আবু আলী ফারেসী তার তাফসীরে উল্লেখ করেছেন যে, কিছু কিছু লোক বলেছে হাদীসে 'মুছাওরার' বা চিত্রকর বলতে ঐসব লোকদের বুঝানো হয়েছে যারা আল্লাহ্‌র আকৃতি সাব্যস্ত করে। অর্থাৎ 'মুজাসসামা' ও 'মুশাব্বাহা' মতবাদীরা, যারা আল্লাহ তা'আলাকে তাঁর সৃষ্টির স্বাদৃশ্যমান বলে বিশ্বাস করে, তাকে শরীর ও কায়া ও রূপের অধিকারী বলে মনে করে। অথচ আল্লাহ হলেন এমন যার স্বাদৃশ্য কোনো কিছু নেই। (অর্থাৎ যিনি তার কোনো সৃষ্টির স্বাদৃশ্যমান নন)।

আবু আলী ফারেসী তার আল হুজ্জা নামক গ্রন্থে এসব কথা উল্লেখ করেছেন, এ ব্যাখ্যা যে নিঃসন্দে অপব্যাখ্যা যা হাদীসের প্রমাণীত শব্দাবলী বুঝায় না তাতে সন্দেহ নেই।

তেমনিভাবে কিছু লোক বলেছেন, সোলায়মান (আ)-এর জন্য যা বৈধ করা হয়েছিল বলে আল কুরআনের উল্লেখ করা হয়েছে, যথা সূরা সাবায় বলা হয়েছেঃ

يَعْمَلُوْنَ لَهٗ مَا يَشَآءُ مِنْ مَّحَارِيْبَ وَتَمَاثِيْلَ

(জিনেরা) তার জন্য তৈরী করে তার ইচ্ছানুযায়ী দুর্গ এ ভাস্কর্য।

(সূরা সাবা ঃ ১৩)

তাদের মতে ভাস্কর্য তৈরী এ উম্মতের জন্য রহিত করা হয় নি। তাদের এ অভিমত আবু জাফর নোহ্‌হাছ উল্লেখ করেছেন, অবশেষে মাক্কীও এ অভিমত তার 'আল হেদায় ইলা বুলুগুন নিহায়া' নামক তাফসীরে উল্লেখ করেছেন।[১] এ ব্যাখ্যাও অপব্যাখ্যা।

তেমনিভাবে যারা ছবি নিষিদ্ধ হওয়া প্রসঙ্গে বর্ণিত হাদীসগুলো মাকরুহ বুঝায় বলে মন্তব্য করেন, কারণ সে সময় ছবি তৈরী ও ব্যবহারের ওপর কঠোরতা আরোপ করা হয়েছিল এ কারণে যে, সময়টা ছিল পৌত্তলিকতার নিকটবর্তি। বর্তমানে এ অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। যারা এরূপ ব্যাখ্যা দেয় তাদের এ ব্যাখ্যও অপব্যাখ্যাই। (কারণ এখনও বিশ্বে লক্ষ কোটি মানুষ পৌত্তলিকতায় বিশ্বাসী)।

১. দেখুন শিল্পি ও আবদুল মজিদ ওয়াফীর প্রবন্ধ "রিসালাতুল ইসলাম" নামক সাময়িকী, সংখ্যা ১৫ রজব ১৩৮৩ হিঃ। এ প্রবন্ধটিও ফাতহী ওসমান তার আল ফিকরুল ইসলামী ওয়াত তাতাওয়ার নামক গ্রন্থে সংকলন করেছেন।

এ জাতীয় কথা এর আগেও বলা হয়েছিল। ইমাম ইবনে দাকীকুল ঈদ তাদের এ জাতীয় বক্তব্যের জবাবও দিয়েছিলেন। একথা নিসন্দেহে বাতিল কারণ এ বক্তব্যে যে কারণ উল্লেখ করা হয়েছে শরীয়ত দাতা তার বিপরীত কারণ উল্লেখ করেছেন। তা হলো চিত্রকর চিত্রাংকনের মাধ্যমে সৃষ্টি কর্মে আল্লাহ্র সৃষ্টির সমকক্ষতা অর্জন করতে চায়। তিনি আরও বলেন, এ কারণটি সাধারণ সঠিক ও উপযুক্ত। কোনো বিশেষ যুগের সাথে নির্দিষ্ট নয়। আমরা সুস্পষ্ট কোনো নাসের কাল্পনিক অর্থ দ্বারা অপব্যাখ্যা করতে পারি না।[১]

সত্য ও সুস্পষ্ট কথা হলো এ কথাগুলো কোনো মুসলিম বিবেক-বুদ্ধিকে নিশ্চিন্ত করতে পারেনি। ফলে ইসলামী সভ্যতা ও ইসলামী জীবন ব্যবস্থার সাধারণ প্রবাহে এর কোনো প্রভাব পড়েনি। অবশ্য কোনো কোনো দেশে কোনো ব্যক্তি সে মতে আমল করেছে। যেমন আমরা স্পেনের গ্রাণাডার "আল হামরা" প্রাসাদে দেখতে পাই। তেমনিভাবে ইমাম কারফী কতৃক তার "নাফায়েসুল উসুল ফি শারহিল মাহসুল" নামক গ্রন্থে বর্ণিত আল কামিল রাজার জন্য তৈরীকৃত এক বাতিঘরের বিবরনে দেখতে পাই। রাতে এক ঘন্টা জ্বলার পর তার একটা দরজা খুলে যেত, তারপর সেখান থেকে রাজার সেবার জন্য একজন লোক বাহির হয়ে আসত ... কারাফী নিজেই একটা বাতিঘর তৈরী করিয়ে ছিলেন যাতে তিনি এমন অতিরিক্ত ব্যবস্থা করিয়েছিলেন যে, বাড়ি-ঘরের আলোর রং প্রতি ঘন্টায় ঘন্টায় পরিবর্তন হতো। তাতে একটা সিংহ ছিল যার চোখের রং অত্যন্ত কালো থেকে অত্যন্ত সাদায় পরিণত হতো, অতপর অত্যন্ত লাল রং ধারণ করত। দুটি পাখির মুখ থেকে দুটি ঘোড়সাওয়ার পড়ত। এক লোক তার অভ্যন্তরে যেত আর এক লোক তা থেকে বের হয়ে আসত। এক দরজা বন্দ হলে অপর দরজা খুলে যেত। প্রতি ঘন্টায় ঘন্টায় তার রং পাল্টাত। যখন সকাল হতো তখন বাতি ঘরের ছাদের ওপর এক লোক দেখা যেত যার কানের মধ্যে থাকত তার হাতের আঙ্গুল। লোকটি আযান দেয়ার প্রতি ইঙ্গিত করত। কারাফী বলেন, তবে আমি এর মুখ দিয়ে কথা বলাতে পারিনি।[২]

ইবনে জোবাইর তার ভ্রমন কাহিনীতে দামেস্কের জামে মসজিদে যে ঘড়িটি ছিল বলে বর্ণনা দিয়েছেন তাও এর কাছাকাছি ছিল। তাতে বাজ পাখীর মূর্তি ইত্যাদি ছিল।

---

১. দেখুন ইবনে দাকীকুল ঈদ আল আহকাম শারহু ওমদাতুল আহকাম, খ. ২ পৃ. ১৭১-১৭৩।
২. ড. আবদুল মজিদ ওয়াফী, প্রাগুক্ত।

ইসলামী সভ্যতার সাধারণ স্বরূপ

তবে ইসলামী সভ্যতার সাধারণ স্বরূপ হলো, ইসলামী সভ্যতা কখনও মানুষ ও প্রাণীর ছবি ও চিত্রকে উৎসাহিত করেনি। বিশেষত তা যদি হয় মূর্তিমান। ইসলামী সভ্যতা হলো মূর্তি মুক্ত সভ্যতা যা ইসলামের তওহীদ মতবাদের সাথে সঙ্গতিশীল। মূর্তিমান সভ্যতা নয় যা পৌত্তলিকতার সাথে বিভিন্নভাবে সামঞ্জস্যশীল।

এ কারণেই ইসলামী সভ্যতায় গ্রাফিক ও করুকার্য শিল্প অত্যন্ত উন্নতি লাভ করে এবং তাতে অতী চমৎকার শিল্প সৃষ্টি হয়।

মুসলিম শিল্পির শিল্পবোধ তার হাত ও তুলির ছোঁয়ায় যে কারুকার্য শিল্প সৃষ্টি হয়েছে তাতে পরিলক্ষিত হয়। তা মসজিদ, আল-কুরআন, অট্টালিকা, বাড়ি-ঘর ইত্যাদিতেও পরিলক্ষিত হয়। দেখা যায় দেয়ালে, ছাঁদে, দরজা-জানালা এবং কখনো কখনো ফ্লোরেও। এমন কি বাড়ির ব্যবহার্য জিনিসে যেমন তৈজশপত্রে, কাপড়-চোপড়ে, বেট-বিছানায় তরবারী ইত্যাদিতে। এবং এতে ব্যবহৃত হয় বিভিন্ন ধরনের উপাদান যথা পাথর, শ্বেতপাথর, মর্মর, মার্বেল পাথর, কাঠ, চিনা মাটির তৈরী জিনিস, চামড়া, আয়না, পাতা, লোহা, পিতল, এবং বিভিন্ন প্রকারের খনিজ দ্রব্য।

আর কারুকার্য শিল্পে প্রবেশ করে বিভিন্ন প্রকারের আরবী ক্যালিগ্রাফী যথা ছুলুছ-নুছখ, রোকা, ফারসী, দেওয়ানী, কুফী ইত্যাদি। এক্ষেত্রে শিল্পীরা অসাধারণ শিল্প নৈপূণ্য দেখিয়েছে। এবং ভবিষ্যত জাতির জন্য রেখে গেছে অতি চমৎকার সৃজনশীল শিল্পকর্ম।

সব চেয়ে বেশি ক্যালিগ্রাফি ও কারুকার্য শিল্প দেখা যায়, আল-কুরআন ও মসজিদে। আমরা এখন বিভিন্ন মসজিদে এ শিল্পের চমৎকার নিদর্শন দেখতে পাই। যেমন মসজিদে নববী, বায়তুল মুকাদ্দাস, দামেস্কের উমাইয়্যা মসজিদ, ইস্তাম্বুলের সোলতান আহমদ ও সোলাইমানিয়া মসজিদে। আর কায়রোর সোলতান হাসান ও মুহাম্মদ মসজিদসহ গোটা মুসলিম বিশ্বের আনাচে কানাচে।

ইসলামী শিল্পকলা সবচেয়ে বেশি প্রতিপলিত হয়েছে স্থাপত্য শিল্পে। সভ্যতার ইতিহাস লেখকরা বলেছেন, স্থাপত্য শিল্পে ইসলামী শিল্পকলার সর্বোত্তম প্রতিফলন ঘটেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে তা অনেকভাবে পরিলক্ষিত হয়েছে। সম্ভবত তার সর্বোত্তম নিদর্শন হল ভারতের তাজমহল, যা পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের একটি বলে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

এভাবেই ছবি তৈরী ও মূর্তি চিত্র কিংবা মূর্তিমান চিত্র অংকন নিষিদ্ধ করণের ফলে শিল্প জগতে অনেক নতুন শিল্পের দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে যা ইসলামী বিশ্বকে আলাদা বৈশিষ্ট্য দান করেছে এবং অনন্য আদর্শ দান করেছে।[১]

১. হায়দার বামাত, মাজালাই আল-ইসলাম, দ্বাদশ অনুচ্ছেদ, খোলাছাতুল ফান আল-ইসলামী, পৃ. ৪০৭-৪৪৫ আরজুমা আদেল যাইতার।

কৌতুক ও আনন্দ বিনোদন শিল্প (কমেডি)

জীবন এক কঠিন যাত্রা। এতে আছে কষ্ট ও বিষণ্ণতা। কোনো মুনষই কোনো না কোনো যন্ত্রণা ও কষ্ট ভোগ না করে পারে না। এমন কি সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্ম নিলেও।

পবিত্র কুরআন এদিকে ইঙ্গিত করে বলেছেন ঃ

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِىْ كَبَدٍ -

আমরা মানুষকে সৃষ্টি করেছি শ্রম নির্ভররূপে। (সূরা বালাদ ঃ ৪)

আর ঈমানদাররাই এই দুনিয়ায় অন্যদের তুলনায় বেশি আপদ-বিপদের সম্মুখীন হন। কারণ এক দিকে তাদের উদ্দেশ্য কঠোর অন্যদিকে তাদের চলার পথে বাঁধা সৃষ্টিকারী ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারীর সংখ্যা অধিক।

এমন কি কোনো কোনো সাহাবীর উক্তি হচ্ছে "মুমিনকে সর্বদা পাঁচটি কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে সময় কটাতে হয়।" এক মুসলিম তাকে হিংসা করে, অপর এক মুনাফিক তাকে ঘৃণা করে, আর এক কাফের তাকে হত্যার চেষ্টা করে, অন্য দিকে শয়তান তাকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে, আর মন সার্বক্ষণিক তার সাথে দ্বিধাদ্বন্ধে লিপ্ত থাকে।

হাদীসে আছে সব চেয়ে কঠোর পরীক্ষার সম্মুখীন হন নবীরা, অতপর তাঁর পরের উত্তম লোকেরা, তারপর পরের উত্তমরা।

এ কারণেই প্রত্যেক লোকের জীবন চলার পথে এমন কিছু জীবনোপকরণ প্রয়োজন যা তার জীবন চলার কষ্ট কিছুটা হলেও লাঘব করবে। তাদের প্রয়োজন এমন কিছু যা তাদের হৃদয় মনকে আন্দোলিত ও আনন্দিত করবে। যাতে তারা হাসতে পারে, আনন্দ বিনোদন করতে পারে। যাতে তাদের হৃদয়কে বেদনা বিষণ্ণতা ও যন্ত্রণা বিভোর করে না রাখে।

এ ধরনের জীবনোপকরণের একটি হলো গান। ইতিপূর্বেই আমরা গান সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। আর একটি জীবনোপকরণ হলো কৌতুক ও হাস্যরস যা মানুষকে হাসায়। তার হৃদয় থেকে দুঃখ-বেদনা, মুখমণ্ডল থেকে বিষণ্ণতা এবং জীবন থেকে যন্ত্রণা দূর করে দেয়।

ইসলাম কি এসব কৌতুক (কমেডি) শিল্প সমর্থন করে, না কি তার সম্পর্কে সংকির্ণতা বোধ করে, তাকে হালাল মনে করে, না কি হারাম গণ্য করে ?

মুসলমানদের বাস্তব জীবনে কৌতুক ও হাস্যরস

দেখা গেছে যে, মানুষ তাদের স্বভাবগতভাবে তাদের সামর্থ অনুযায়ী এবং তাদের ধর্মের সহনশীলতানুযায়ী নানান প্রকারের আনন্দ-বিনোদনের উপায় আবিষ্কার করেছে, যা তাদেরকে হাসায় ও আনন্দ দেয়।

এর মধ্যে একটা হলো 'রসিকতা', যাতে মিসরীরা নৈপুণ্যতা এনেছে এবং বিভিন্ন জাতি গোষ্টির মধ্যে প্রসিদ্ধ লাভ করেছে। এর বিভিন্ন প্রকার আছে। এবং ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যও আছে। তার মধ্যে এক প্রকার হলো 'রাজনৈতিক রসিকতা'। এর মাধ্যমে শাসক শ্রেণী ও তাদের সহযোগিদের উপহাস করা হয়। বিশেষত রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ও সৈরাচারিতার সময়।

মানুষ একস্থানে একত্রিত হলেই এ ধরনের রসিকতা করে। তারা যে কষ্টে দিন যাপন করছে তা ভোলার চেষ্টা করে এবং হাসী-খুশীতে দিন কাটাবার প্রয়াস চালায়। কখনও কখনও এ ধরনের রসিকতা বিখ্যাত কোনো কৌতুক শিল্পীর নামেই চালিয়ে দেয়। যেমন নাসিরুদ্দিন হুজ্জা, আবু নাওয়াছ প্রমুখ। আবার কখনও তা কারো নামে চালায় না।

তাছাড়া এক শ্রেণী মানুষ আছে যারা অন্যদের কৌতুক বলেনা, বরং নিজেরাই তাৎক্ষণিক ভাবে এসব কৌতুক অবিষ্কার করে। কৌতুক শিল্পীরা এরূপ কৌতুক সৃষ্টি করতে পারে। যেমন প্রাচীন যুগের "আশ আব" এবং আধুনিক যুগের শেখ আবদুল আজিজ বিশরীর কথা বলা হয়।

মিসরে কৌতুক কেন্দ্রিক এক প্রকারের বিশেষ সাময়িকীও আছে। তার মধ্যে প্রসিদ্ধ এক মেগাজিনের নাম হলো আল-বাকুফা।

এ শিল্পের সাথে সম্প্রিক্ত করা যায়, "কাফাশাত" শিল্পকে, যাকে মিসরীরা 'অন্তমিলে প্রবেশ' বলে থাকে। তা হলো একটি সুনির্দিষ্ট বিষয়ে একধরনের রূপক ও পরোক্ষ শব্দের ব্যবহার। এতে দুই পক্ষই বাক্য বিনিময় করে থাকে।

এ ধরনের আর এক শিল্প হলো একধরনের খেলা, যা মানুষকে হাসায় ও আনন্দ দেয়। যেমন অন্তমিল কবিতা রচনার খেলা। এ ধরনের আর একটি শিল্প হলো খিয়ালুজ্জিল বা পুতুল নাচ, যা এক ধরনের কৌতুক অভিনয় সম্বলিত। এ ধরনের আরও কয়েকটি হলো ধাধা, হেঁয়ালী, যাকে কিনা সাধারণ মানুষ ফাওয়াযির বলে।

এর মধ্যে আর একটি হলো, রম্য গল্প ও রম্য ছড়া এবং রম্য রচনা, যাকে সাধারণ মানুষ আনন্দ দায়ক গল্প বলে। এ ধরনের আর এক শিল্পের নাম বাকধারা, এসব বাকধারা মধ্যে অনেকগুলো মানুষকে তৃপ্তি দেয়। এভাবে আনন্দ বিনোদনের অনেক উপায়-উপকরণ মানুষ আবিষ্কার করেছে বিভিন্ন পরিচিত অপরিচিত শিল্পীদের মাধ্যমে। যা প্রত্যেক পরিবেশ পরিস্থিতির সাথে সঙ্গতিশীল। এবং তার মূল্যবোধ ও নৈতিকতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

আর প্রত্যেক যুগেই নতুন কিছু সংযোজন করে পুরাতন কিছুকে উন্নত করে, কখনো কিছু কিছু পরিহার করে। তেমনি আমরা বর্তমান যুগে ব্যঙ্গ চিত্র বা কার্টুন নামক এক প্রকার শিল্প দেখতে পাই। এ শিল্পে একটা বাক্যকে একটা বক্তব্যপূর্ণ চিত্রে পরিণত করা হয়। তার সাথে কখনও কোনো বক্তব্য থাকে আবার কখনও থাকেও না।

আমি অনেকবার হাসি-ঠাট্টা ও আনন্দ-বিনোদন সম্পর্কে ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি কি? এ প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছি। কারণ কিছু কিছু ধার্মিককে দেখা যায় যে, তাদের মুখে হাসি-ঠাট্টা নামক কোনো জিনিস নেই, তারা সব সময় গোমরামুখী হয়ে থাকে। তারা কখনও রসিকতা করতে জানেনা। ফলে অনেক লোক ধারণা করতে আরম্ভ করেছে যে, এটাই বুঝি ধর্মের প্রকৃতি। এটাই বুঝি ধার্মিকদের স্বভাব।

এ প্রসঙ্গে আমার উত্তর ছিল, হাসাহাসি মানুষেরই বৈশিষ্ট্য। পশুরা কখনও হাসতে পারে না। কারণ হাসি আসে এমন কিছু জানা বুঝা ও দেখার পর যা হাসির উদ্রেক করে তা তাদের করে না।

এ কারণেই বলা হয় মানুষ হাস্যরসাত্মক প্রাণী। তাই এ কথাও সত্য হয়ে ওঠে যে, আমি হাসি সুতরাং আমি মানুষ।

ইসলাম একটা স্বভাবজাত ধর্ম হিসেবে কল্পনাও করা যায় না যে, এ ধর্ম মানুষের হাস্য-রসের মতো সহজাত প্রবৃত্তিকে নিষিদ্ধ করবে। বরং ইসলাম তার বিপরীতে এমন সব বিষয়কে উৎসাহিত করে যা জীবনকে হাস্যরস সম্পন্ন ও পুতপবিত্র করে। ইসলাম চায় মুসলমানের ব্যক্তিত্ব সুবিবেচক হাস্যোজ্জল ও প্রফুল্য চিত্ত্ব সম্পন্ন হোক। ইসলাম চায়না মুসলমান বিষণ্ন মলিন ও দুঃখবাদী হোক। যা জীবন ও মানুষের দিকে সর্বদা কালো দৃষ্টিতে দেখে।

এ ক্ষেত্রে মুসলমানদের উত্তম আদর্শ হলো রাসূল (স)। রাসূল (স) তাঁর শত দুঃশ্চিন্তা ও নানান প্রকারের সমস্যা থাকা সত্ত্বেও রসিকতা করতেন। এক্ষেত্রে সত্য বৈ মিথ্যা বলতেন না। আর সাহাবীদের সাথে স্বাভাবিক সাধারণ জীবন

যাপন করতেন। তাদের হাঁসি-ঠাট্টা, খেলা-ধুলা ও রসিকতায় শরিক হতেন। যেমন তাদের দুঃখ-বেদনা, আপদ-বিপদ ও সমস্যায় শামিল ও শরিক হতেন।

যাইদ ইবনে সাবিত একবার রাসূলে করীম (স)-এর অবস্থা বলার জন্য তাকে বলা হলে বলেন, আমি তাঁর [রাসূল করীম (স)] প্রতিবেশী ছিলাম, যখন তার কাছে ওহী আসত তখন আমাকে ডেকে পাঠাতেন। আমি এসে ওহী লিখে রাখতাম। আমরা যখন দুনিয়ার বিষয়ে আলোচনা করতাম তখন তিনিও আমাদের সাথে আলোচনায় অংশগ্রহণ করতেন। আর যখন আখেরাতের কথা বলতাম তখন তিনিও আমাদের সাথে আলোচনা করতেন। যখন আমরা খাওয়া দাওয়ার কথা বলতাম তিনিও আমাদের সাথে তা আলোচনা করতেন। তিনি বলেন, এসব আমি রাসূল (স) থেকেই তোমাদের বলছি।[১]

তাঁর সাহাবীরা তাঁর সম্বন্ধে বলেন, তিনি ছিলেন সবচেয়ে বেশি রসিক মানুষ।[২]

আমরা দেখতে পেতাম যে, তিনি তাঁর বাড়িতে তাঁর স্ত্রীদের সাথে রসিকতা ও কৌতুক করতেন, তাদের গল্প শুনাতেন। যেমন বুখারীতে বর্ণিত বিখ্যাত উম্মে যারা নামক হাদীসে তা আমরা দেখতে পাই। যেমন তা আমরা দেখতে পাই আয়শা (রা)-এর সাথে তাঁর দৌড় প্রতিযোগিতায়। একবার হযরত আয়শা (রা) প্রতিযোগিতায় তাকে পরাজিত করেন। কিছু দিন পর আর একবার প্রতিযোগিতায় তিনি আয়শা (রা)-কে পরাজিত করেন। তখন তিনি তাকে বলেন এটা ওটার প্রতিশোধ।

বর্ণিত আছে যে, একবার তিনি তাঁর দুই নাতি হাসান হুসাইনের জন্য নির্দ্ধিধায় ও নিঃসংকোচে তাঁর পিট নিচু করে দেন, যাতে তারা ওপর উঠতে পারে এবং আনন্দ উপভোগ করতে পারে। তখন তাঁর কাছে এক সাহাবী আসলেন এবং এ দৃশ্য দেখে বললেন, তোমরা উত্তম বাহনের ওপর আরোহন করেছ। তখন তিনি বললেন, 'তারা দুজন উত্তম সাওয়ারীও বটে।'

আমরা আরও দেখতে পাই যে, একবার এক বৃদ্ধা এসে তাকে বলেন, আমার জন্য দো'আ করুন আল্লাহ আমাকে যেন জান্নাতে প্রবেশ করার সুযোগ দেন। তখন তিনি তাকে বলেন, হে অমুকের মা! জান্নাতে তো বৃদ্ধারা যেতে পারবেনা। তখন মহিলাটি কাঁদতে আরম্ভ করে কারণ তিনি রাসূলের কথার বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করেছে (তার তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারেনি)। তখন

---

১. তাবারানী কর্তৃক উত্তম সনদে বর্ণিত, দেখুন মাজমাউয যাওয়ায়েদ, খ. ৯ পৃ. ১৭।
২. কানযুল উম্মাল, নং ১৮৪০০

রাসূল করীম (স) তাকে বুঝিয়ে দিলেন যে, যখন তিনি জান্নাতে প্রবেশ করবেন তখন বৃদ্ধাবস্থায় প্রবেশ করবেন না; বরং যুবতী ও সুন্দরী হয়ে যাবেন। অতপর মহিলার সামনে আল্লাহ্‌র এ বাণী তেলাওয়াত করলেন ঃ

إِنَّا أَنْشَأْنٰهُنَّ إِنْشَاءً - فَجَعَلْنٰهُنَّ أَبْكَارًا - عُرُبًا أَتْرَابًا

আমি জান্নাতি রমনীগণকে বিশেষ রূপে সৃষ্টি করেছি। অতপর তাদেরকে করেছি চিরকুমারী কামিনী সমবয়স্কা।[১]

একবার এক লোক এসে রাসূলে করীম (স)-এর কাছে আরোহনের জন্য একটা উট চাইল। তখন রাসূলে করীম (স) তাকে বললেন, আমি তোমাকে একটা উষ্ট্রির বাচ্চা দিতে পারি। তখন লোকটি বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি উষ্ট্রির বাচ্চা নিয়ে কি করব ? তখন রাসূল করীম (স) বললেন, উট কি উষ্ট্রির বাচ্চা ছাড়া অন্য কিছু ?[২]

যাইদ ইবনে আসলাম বলেন, এক মহিলা— যাকে উম্মে আইমান নামে ডাকা হয়— নবী করীম (স)-এর কাছে আসলেন, অতঃপর তাকে বললেন, আমার স্বামী আপনাকে ডাকছেন, তিনি বললেন, তিনি কে ? তিনি কি সে লোক যার চোখে সাদা রং আছে ? মহিলা বলল, আল্লাহ্‌র কছম তার চোখে সাদা নেই। তখন রাসূলে করীম (স) বললেন, হাঁ, তার চোখে সাদা রং আছে। তখন মহিলা বললেন, না নেই। তখন মহানবী (স) বললেন, প্রত্যেকের চোখেই সাদা রং আছে।[৩] অর্থাৎ তিনি কালো রং এর চতুর্পার্শ্বের সাদা রংকে বুঝাতে চাইলেন।

আনাস (রা) বলেন, আবু তালহার এক ছেলে ছিল, তার নাম ছিল আবু ওমাইর। রাসূল করীম (স) তাদের কাছে আসতেন এবং বলতেন, হে আবু ওমাইর নোগাইরের কি অবস্থা ?[৪] নোগাইর এক চড়ই পাখির বাচ্চা, আবু ওমাইর সেটা নিয়ে খেলত।

---

১. তিরমিযী কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ হাদীসটি আবু দাউদও বর্ণনা করেছেন।

২. সূরা ওয়াক্বিয়া ঃ ৩৫-৩৭; হাদীসটি তিরমিযী শামায়েলে বর্ণনা করেছেন। এবং আবদ ইবনে হুসাইদ ইবনে মানযার বায়হাকী ও আলবানী গাইয়াতুল মুরাম হাসান বলে মন্তব্য করেছেন।

৩. যোবাইর ইবনে বাকযার কর্তৃক, আল ফুকাহা ওয়াল মারাহ নামক গ্রন্থে বর্ণিত, হাদীসটি ইবনে আবদুনিয়া ও ওবাইদ ইবনে ছাহাম আল কাহারী থেকে কিছুটা ভিন্ন ভাবে বর্ণনা করেছেন। ইরাকী কর্তৃক 'এহইয়াউ উলুমুদ্দিন'-এর টিকায় দেখুন।

৪. বুখারী, মুসলিম।

আয়শা (রা) বলেন, আমার কাছে রাসূল (স) ও সাউদা বিনতে যামআ ছিলেন, তখন আমি পায়েশ রান্না করলাম এবং তা নিয়ে আসলাম, সাওদাকে বললাম খাও। সে বলল, আমার তা ভালোলাগেনা। তখন আমি বললাম অবশ্যই খাবে, না হয় তা তোমার মুখে মেখে দেব। সে বলল, আমি এতে স্বাদ পাইনা। তখন আমি পাত্র থেকে কিছু পায়েশ নিজের হাতে নিলাম এবং তা তার মুখে লাগিয়ে দিলাম। তখন রাসূল (স) আমার ও তার মধ্যে বসা ছিলেন, তখন রাসূল করীম (স) তার জন্য নিজের হাটু দুটি নিচু করে দিলেন যাতে সে আমার থেকে বাঁচতে পারে। তখন পাত্র থেকে আমি আর কিছু পায়েশ নিলাম এবং তা আমার নিজের মুখে মাখলাম। এ কাণ্ড দেখে রাসূল করীম (স) হাসতে লাগলেন।[১]

আরও বর্ণিত আছে যে, দাহহাক ইবনে সুফিয়ান আল-কালারী ছিলেন এক কুৎসিত লোক। রাসূল করীম (স) যখন তার বাইয়াত নিলেন, তখন তিনি বলেন আমার দুজন স্ত্রী আছে। তারা দুজনই এই (আয়শার দিকে ইঙ্গিত করে বলেন) সুন্দরীর চেয়ে বেশি সুন্দরী। ঘটনা পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বের। আমি কি তাদের দুজনের একজনকে ছেড়ে দেব, তাহলে আপনি তাকে বিয়ে করতে পারেন ? তখন হযরত আয়শা (রা) কাছেই ছিলেন। তার কথা শুনছিলেন। তখন আয়শা বললেন, তারা কি বেশি সুন্দর না কি তুমি ? তখন লোকটি বলল, আমিই বেশি সন্দুর ও উত্তম। আয়শার এ প্রশ্ন ও লোকটির জবাব শুনে রাসূল (স) হাসতে থাকলেন, কেননা লোকটি ছিল কুৎসিত।[২]

রাসূল (স) মানুষের জীবনকে আনন্দ ও ফুর্তিময় করতে পছন্দ করতেন। বিশেষত বিভিন্ন উপলক্ষে যেমন ঈদের দিন ও বিয়ে অনুষ্ঠানে।

হযরত আবু বকর (রা) যখন তরুণী দুটিকে ঈদের দিন রাসূল (স)-এর বাড়িতে গান করতে দেখে তিরিষ্কার করলেন তখন তিনি তাকে বললেন, ওদেরকে গাইতে দাও। কোনো কোনো বর্ণনায় আছে রাসূল (সা) বলেছেন, "যাতে ইহুদীরা জানতে পারে যে, আমাদের ধর্মে আনন্দ-বিনোদনের সুযোগ আছে।"

---

১. যোবাইর ইবনে বাককার, পূর্বোক্ত, হাদীসটি আবু ইরানীও বর্ণনা করেছেন উত্তম সনদে। দেখুন ইয়াহ ইয়ায়ু উলুমুদ্দিনের টিকা।

২. হাফেয ইরাকী বলেন, এ হাদীসটি যোবাইর ইবনে বাককার আল ফেকাহা ওয়াল মারহ নামক গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে হাসান থেকে মুরসাল ও মুদাল সনদে। আর দারেকুতনীতে এ ধরনের একটা ঘটনা বর্ণিত হয়েছে আবু হুরায়রা থেকে উয়াইনা ইবনে হাসান কাজারীর ঘটনা হিসেবে। পর্দার আয়াত অবর্তীণ হবার পরের ঘটনা হিসেবে।

তিনি হাবশীদেরকে তাঁর মসজিদে এক ঈদের দিন তাদের তীর ধুনক নিয়ে খেলতে অনুমতি দিয়েছিলেন। এবং তাদেরকে উৎসাহিত করতে গিয়ে বলছিলেন, আরফাদার ছেলেরা এগিয়ে যাও।

আর আয়শাকে তাঁর পিছনে দাড়িয়ে তাদের খেলা ও নৃত্য দেখার অনুমতি দিলেন, এ খেলা দেখায় কোনো সমস্যা ও ধর্ম-বিরোধিতা দেখতে পেলেন না।

আর একদিন এক তরুণীকে তাঁর বাসর ঘরে পাঠাবার সময় নিরবে আনন্দ উপকরন ও গায়িকা ছাড়া পাঠানোর জন্য নিন্দা করলেন এবং বললেন, তার সাথে গান গাইবার জন্য কেন কাউকে পাঠালেনা। তারা গিয়ে গাইত— "আমরা তোমাদের কাছে এসেছি এসেছি। আমাদের স্বাগত জানাও, আমরা ও তোমাদের স্বাগত জানাব।

রাসূলের সাহাবী ও তাবেয়ীরা উত্তম যুগের লোক হয়েও নবীর অনুসরন করে হাসাহাসি ও রসিকতা করতেন। এমন কি উমর ইবনে খাত্তাব (রা)— তিনি কঠোর ও গম্ভির বলে প্রসিদ্ধি লাভ করার পরও— থেকে বর্ণিত আছে, তিনি তাঁর এক দাসীর সাথে রসিকতা করেছিলেন। তাকে বলেছিলেন, আমাকে সৃষ্টি করেছে ভদ্রলোকদের স্রষ্টা আর তোমাকে সৃষ্টি করেছেন নিকৃষ্টদের স্রষ্টা। যখন দেখলেন দাসীটি একথা বিব্রত বোধ করছে তখন তাকে ব্যাখ্যা করে বলেন, ভদ্রলোক ও নিকৃষ্ট লোকদের স্রষ্টা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ আছেন কি ?

নবী করীম (স) এর জীবনে এরূপ রসিকতার কথা তারা অনেকেই জানেন। তারা তা স্বীকারও করেন। এ ধারা অব্যাহত ছিল রাসূলের পর সাহাবাদে মধ্যেও। তারা এতে নিন্দার কিছু দেখতে পাননি। অথচ এ ধরনের যেসব ঘটনা সে যুগে ঘটেছিল বলে বর্ণিত আছে তা যদি আজকের দিনে ঘটে তাহলে আজকের অধিকাংশ ধার্মিকরা তার তীব্র নিন্দা করবে। এবং যারা এরূপ ঘটনা ঘটায় তাদেরকে ফাসিক ফজির গণ্য করবে।

এরূপ রসিক হাস্যরসকারী হিসেবে প্রসিদ্ধদেরই একজন হলেন নেয়াইমান ইবনে আমর আল আনসারী (রা)। তাঁর রসিকতার অনেক আশ্চর্য ও বিস্ময়কর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

আরও উল্লেখ আছে যে, যারা দ্বিতীয় আকাবার শপথে উপস্থিত ছিলেন তিনি তাদেরই একজন। তিনি বদর, ওহুদ ও খন্দক ইত্যাদি যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেছিলেন।

যোবাইর ইবনে বককার মঝার মঝার কিছু বিস্ময়কর ঘটনা তার "আল ফোকাহা ওয়াল মারাহ' নামক গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। আমরা এখানে সেরূপ কিছু ঘটনা উল্লেখ করছি।

তিনি বলেন, মদীনায় যখন কোনো দুর্লভ জিনিস আসত তিনি তখন তার কিছু জিনিস কিনতেন। অতপর সেগুলো রাসূল (স)-এর কাছে নিয়ে আসতেন, তারপর বলতেন, এগুলো আমার পক্ষ হতে আপনার জন্য উপহার। যখন মালিক এসে মূল্যের জন্য নোয়াইমানকে তালাশ করত তখন তাকে নিয়ে রাসূল (স)-এর কাছে আসতেন আর বলতেন, একে তার পণ্যের মূল্য পরিশোধ করে দিন। তখন রাসূল (স) বলতেন, তুমি কি তা আমাকে উপহার হিসেবে দাওনি ? তখন বলতেন, আল্লাহ্‌র কছম আমার কাছে কিনার মতো পয়সা ছিল না। তবে আমার ভালো লাগছিল তা আপনাকে খাওয়াতে। তখন রাসূল (স) হাসতেন আর মালিককে মূল্য পরিশোধের আদেশ দিতেন।

যোবাইর রাবিয়া ইবনে ওসমান (রা)-এর সূত্রে আর একটা ঘটনা বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, এক বেদুঈন নবী করীম (স)-এর কাছে আসলেন, এসে তার বাড়ির আঙ্গিনায় উটটি থামালেন। তখন জনৈক সাহাবী নোয়াইমানকে বললেন, আপনি যদি উটটি যবেহ করতেন তাহলে আমরা তা খেতে পারতাম, কারণ আমরা গোস্তের প্রতি প্রচণ্ড আগ্রহী হয়ে উঠেছি। তখন তিনি উটটি যবেহ করলেন। তখন বেদুঈন লোকটি বের হয়ে এসে চিৎকার করতে আরম্ভ করল। হে মুহাম্মদ! আমার উট যবেহ করে দিয়েছে। তখন নবী রকীম (স) ঘর থেকে বের হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, একাজ কে করেছে ? সাহারীরা বললেন, নোয়াইমান করেছে। তখন তাকে খোঁজার উদ্দেশ্যে মহানবী (স) বের হলেন এ প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করার জন্য। অতপর তাকে পাওয়া গেল যুবাআ বিনতে আবদুল মুত্তালিবের বাড়ির ভিতর এক গর্তে, যার ওপর খেজুরের ঢাল দিয়ে ঢাকা। তখন এক লোক রাসূল (স)-কে ইঙ্গিত করে বললেন, ঐ যে ওখানে। অতপর তাকে সেখান থেকে বের করা হলো। অতপর জিজ্ঞাসা করলেন, কেন তুমি এরূপ করলে ? তিনি বললেন, যারা হে আল্লাহ্‌র রাসূল আমাকে দেখিয়ে দিয়েছেন তারাই আমাকে একাজ করতে আদেশ করেছেন। রাবী বলেন, তখন তিনি তার মুখমণ্ডল থেকে ধুলা ঝাড়ছিলেন আর হাসতে ছিলেন। অতপর বেদুঈনকে তার উটের ক্ষতিপূরণ দেয়া হলো।

যোবাইর আরও বলেন, আমার চাচা আমাকে আমার দাদার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। বলেছিলেন, মাখরামা ইবনে নাওফেলের বয়স একশত পনের হয়েছিল। তিনি একবার মসজিদেই পেশাব করতে চাইলে তখন লোকেরা চিৎকার দিয়ে মসজিদ মসজিদ বলে তাকে থামালেন। তখন নোয়াইমান ইবনে আমের নিজ হাতে একটু দূরে নিয়ে মসজিদের অপর এক প্রান্তে দাঁড় করালেন। তারপর তাকে বললেন, এখানেই পেশাব করো। রাবী বলেন, তখনও লোকেরা

চিৎকার দিয়ে নিষেধ করল। তিনি বললেন, তোমাদের সর্বনাশ হোক, আমাকে এখানে কে এনেছে ? তারা বললেন, নোয়াইমান। তিনি তখন বললেন, আল্লাহ্র কছম আমি যদি তাকে পাই তাহলে আমার এ লাঠি দিয়ে আচ্ছা করে পিটাব। এ সংবাদ নোয়াইমানের কাছে পৌঁছে যায়। এরপর কিছু দিন অতিবাহিত হয়। অতপর নোয়াইমান একদিন মাখারামার কাছে আসেন। তখন ওসমান (রা) মসজিদের এক প্রান্তে নামায আদায় করছিলেন। তখন নোয়াইমান মাখরামাকে বলেন, তুমি কি নোয়াইমানকে পেতে চাও ? মাখরামা বললেন, হ্যাঁ, তখন তিনি মাখরামার হাত ধরে ওসমানের সামনে নিয়ে গেলেন, ওসমান (রা) যখন নামায আদায় করতেন তখন এদিক সেদিক তাকাতেন না। তারপর বললেন, এই যে আপনার সামনে নোয়াইমান দাঁড়িয়ে আছে। তখন তিনি দুহাতে লাঠিটা ধরলেন তারপর ওসমান (রা)-কে জোরে বাড়ি দিলেন। ফলে তিনি আঘাত প্রাপ্ত হলেন। তখন লোকেরা চিৎকার দিয়ে বললেন, হায় হায় কি করলে তুমি, আমীরুল মুমেনীনের গায়ে আঘাত করলে ? তারপর বাকি ঘটনার বিবরণ দিলেন।[১]

আর এক রম্য ঘটনা হলো, এক রসিক সাহাবী নোয়াইমানকে (তিনি যেমন অন্যদেরকে রসিকতা করে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলতেন তেমনি তাকে) একবার বিব্রতকর অবস্থায় ফেলেছিলেন। যেমন তার সাথে সোয়াইবেত ইবনে হারমালার ঘটে যাওয়া ঘটনায় দেখা যায় তিনিও বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী সাহাবী ছিলেন। ইবনে আবদুল বার 'আল ইস্তিয়াব' গ্রন্থে সোয়াইবেতের জীবনী আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, তিনি অতি রসিক ও হাসীখুশি মানুষ ছিলেন। নোয়াইমান এবং আবু বকর (রা)-কে জড়িয়ে তার একটা মজার ঘটনা আছে। আমরা এখানে ঘটনাটি উল্লেখ করতে চাই। কারণ তাতে চালাকি রসিকতা ও উত্তম চরিত্রের বিবরণ পাওয়া যায়।

উম্মে সালামা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু বকর (রা) একবার বসরার দিকে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে বের হলেন। এটা রাসূল (স)-এর ওয়াফাতের এক বছর পূর্বের ঘটনা। তখন তাঁর সাথে ছিল নোয়াইমান ও সোয়াইবেত নাম্নি দুই সাহাবী। তারা উভয়ই বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তখন নোয়াইমানের দায়িত্ব ছিল খাবার তৈরী ও পরিবেশন ইত্যাদি। তখন এক দিন সোয়াইবেত তাকে বললেন, —তিনি অত্যন্ত হাস্য-রসাত্মক লোক ছিলেন— আমাকে খাবার দাও। নোয়াইমান বললেন, না ! আবু বকর (রা) না আসা পর্যন্ত দেয়া যাবে না। তখন সোয়াইবেত বললেন, আল্লাহ্র কছম আমি কিন্তু তোমাকে এর মজা

১. ইবনে হাজর আল ইছাবা, যোবাইর ইবনে বাককার থেকে 'আল-ফেকাহা ওয়াল মারাহ' নামক গ্রন্থ থেকে বর্ণিত।

দেখাব। তারপর তিনি এক কাফেলার কাছে গিয়ে তাদেরকে বললেন, তোমরা কি আমার একটা গোলাম কিনবে ? তারা বলল, হাঁ কিনব। তিনি বললেন, এ গোলামটির কিছু কথা আছে। সে আপনাদের বলবে, আমি গোলাম নই, স্বাধীন। আপনারা যদি তার একথা শুনে তাকে ছেড়ে দেন (অর্থাৎ ক্রয় না করেন) তাহলে এখনই বলেন, যাতে আমার সাথে আমার গোলামের সম্পর্ক নষ্ট না হয়। তারা বললেন, ঠিক আছে আমরা কিনব। রাবী বলেন, অতপর তারা দশ বস্তা খেজুরের বিনিময়ে কিনল। রাবী বলেন, অতপর তারা এসে তার (নোয়াইমানের) গলায় পাগড়ী বা রসি বেঁধে নিয়ে গেল। এ অবস্থার নোয়াইমান বলল, ও আপনাদের সাথে তামাশা করছে। আসলে আমি স্বাধীন গোলাম নই। তারা বলল, আমরা তোমার এসব কথা জানি। অতপর তাকে নিয়ে গেল। অতপর আবু বকর (রা) আসলেন, তখন সোয়াইবেত আবু বকর (রা)-কে এ ঘটনা বললেন, তখন আবু বকর তাদের কাছে লোক পাঠালেন এবং তাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসলেন। যখন তাঁরা মদীনায় নবী করীম (স)-এর কাছে ফিরে গিয়ে এ ঘটনা নবী করীম (স)-কে শুনালেন। তখন তিনি ও তার সাহাবীরা এ ঘটনা শুনে এবং তা স্মরণ করে প্রায় এক বছর পর্যন্ত হেসেছিলেন।[১]

কট্টরপন্থীদের অবস্থান

এক ধরনের প্রজ্ঞাবান কবি-সাহিত্যিক আছেন যারা রসিকতা ও হাসি-ঠাট্টার বিরুদ্ধে নিন্দা করেছেন এবং তার কুফল সম্বন্ধে সতর্ক করেছেন। তারা এর কুফল ও মন্দ দিকটি দেখেছেন, অন্যান্য দিকগুলো সম্বন্ধে অমনযোগী ও বিস্মৃত রয়েছেন।

কিন্তু রাসূল ও সাহাবাদের থেকে যা বর্ণিত হয়েছে তার অনুসরণ করাই সঠিক ও উত্তম। তা-ই ভারসম্যপূর্ণ ও ন্যায়সঙ্গত।

একবার হানযালা (রা) রাসূল (স)-এর সামনে এবং বাড়িতে তাঁর অবস্থার যে পরিবর্তন ঘটে তা দেখে তিনি সংকিত হলেন এবং নিজের মধ্যে এটা মুনাফেকী আছে কিনা সন্দেহ করলেন। এ ব্যাপারে রাসূল (স)-কে জিজ্ঞাসা করলে মহানবী (স) তাকে বললেন, "হে হানযালা! তোমরা আমার সামনে থাকলে তোমাদের যে অবস্থা থাকে তা যদি স্থায়ী হতো তাহলে ফেরেশতারা

১. ইবনে আবু শাইবা ও ইবনে মাজাহ কর্তৃক বর্ণিত, এ ঘটনাটি আবু দাউদ তায়ালিস ও রোয়ানীও বর্ণনা করেছেন, তবে তারা নোয়াইমানকে রসিকতাকারী আর সোয়াইবেতকে বিক্রেতা হিসেবে বর্ণনা করেছেন। দেখুন সোয়াইবেতের জীবনী, আল ইছাবা গ্রন্থে।

তোমাদের সাথে রাস্তায় হাত মেলাত। তবে হে হানযালা, কিছুক্ষণ কিছুক্ষণ।" এটাই হলো ফিৎরাত বা স্বভাব আর এটাই হলো ইনসাফ ও সুবিচার।

ইবনে আবু শায়বা সালমা ইবনে আবদুর রহমান থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, রাসূল (স)-এর সাহাবীরা সংকুচিত ও সংকির্ণমনা ছিলেন না। তারা কবিতা আবৃত্তি করতেন, তাদের জাহিলী যুগের বিষয়গুলো আলোচনা করতেন। তাদের কারো কাছে কোনো ধর্মীয় কাজ কামনা করা হলে তখন চোখ দুটি পাগলের ন্যায় ঘুরতে থাকত।[১]

ইবনে শীরিনকে সাহাবাদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হয়— তারা কি রসিকতা করতেন ? তখন তিনি বলেন, তারাও মানুষ ছিলেন। ইবনে উমর (রা) রসিকতা করতেন ও কবিতা আবৃত্তি করতেন।[২]

এ আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে, এসব বিষয়ে ঐসব ধর্মিক এবং ধর্ম নিয়ে অতী উৎসাহী লোকদের অবস্থান, তাদের গোমরামুখী হয়ে হাস্যরস বিহীন থাকা— যাকে এক শ্রেণীর মানুষ ধর্মের মূল শিক্ষা বলে মনে করে— এর সাথে ধর্মের তেমন কোনো সম্পর্ক নেই। তাদের এ অবস্থান রাসূল (স) ও সাহাবাদের জীবনাদর্শের সাথেও সঙ্গতিশীল নয়।

তাদের এ অবস্থান মূলত ইসলাম না বুঝার কারণেই। কিংবা ব্যক্তিগত স্বভাব অথবা যে পরিবেশ ও তারবিয়ত পেয়ে তারা বেড়ে উঠেছে তার কারণেই।

যাই হোকনা কেন, একথা কারো কাছে অজানা নয় যে, ইসলামের শিক্ষা কোনো ব্যক্তি বিশেষ কিংবা দল বিশেষের আচার-আচরণ ও অবস্থান থেকে তা ভালো-মন্দ যাই হোকনা কেন নেয়া যায় না। কারণ ইসলামই হলো তাদের জন্য হুজ্জত। তারা ইসলামের জন্য হুজ্জত নয়। ইসলাম নিতে হয় কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ থেকে।

হাস্যরস ও রসিকতার বৈধ সীমানা

হাস্যরস ও রসিকতা ইসলামে বৈধ। ইতিমধ্যে রাসূল (স)-এর উক্তি এবং আমল এবং সাহাবাদের কর্মকাণ্ড থেকে তার প্রমাণ আমরা উপস্থিত করেছি।

একে বৈধ করা হয়েছে মানব প্রকৃতিতে কিছু আনন্দ বিনোদনের প্রয়োজন আছে বলেই, যা জীবনের দুশ্চিন্তা বেদনা কাঠিন্নতা ও ভারকে কিছুটা হলেও হালকা করে দেয়। তেমনিভাবে এ ধরনের আনন্দ বিনোদন মনকে কিছুটা হলেও

---

১. ইবনে আবু শায়বা, আল মুছান্নাফ খ. ৮ পৃ. ৭১১
২. আবু নাঈম "আলহলিয়্যা" খ. ২ পৃ. ২৭৫।

উৎফুল্ল করার দায়িত্ব পালন করে। ফলে দীর্ঘক্ষণ কর্ম অব্যাহত ভাবে চালিয়ে যেতে পারে। মানুষ দীর্ঘ সফরে তার বাহনকে যেমন বিশ্রাম দেয়— যাতে সে ক্লান্ত হয়ে না পড়ে— তেমনি ভাবে জীবন চলার পথে মনকেও বিশ্রাম দিতে হয় আনন্দ-বিনোদনের মাধ্যমে।

আসলে হাস্যরস ও রসিকতা আনন্দ বিনোদন বৈধ হবার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। তবে তা অবশ্যই কিছু গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ ও শর্ত স্বাপেক্ষ হতে হবে। শর্তগুলো হলো ঃ

এক ঃ মানুষকে হাসাবার উপায় উপকরণ যেন মিথ্যা ও বানোয়াট কিছু না হয়। যেমন কিছু কিছু লোক তা ১লা এপ্রিলে করে থাকে 'এপ্রিল ফুল' নামে। এ কারণেই রাসূল (স) বলেছেন, যে লোক কথা বলার সময় মানুষকে মিথ্যা কথা বলে তার সর্বনাশ হোক, তার সর্বনাশ হোক, তার সর্বনাশ হোক।[১] রাসূল (স) রসিকতা করতেন সত্য কিন্তু সত্য বৈ মিথ্যা বলতেন না।

দুই ঃ এ রসিকতায় অপর কোনো মানুষকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল করার ও ঠাট্টা-বিদ্রুপ করার মতো কিছু যেন না থাকে। তবে সে ব্যক্তি যদি সন্তুষ্ট চিত্তে অনুমতি দেয় তাহলে ভিন্ন কথা।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّنْ نِّسَآءٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ج وَلَا تَلْمِزُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ –

"হে ঈমানদারগণ কেউ যেন অপর কাউকে বিদ্রুপ ও উপহাস না করে। কেননা সে উপহাসকারী অপেক্ষ উত্তম হতে পারে। এবং কোনো নারী অপর কোনো নারীকেও যেন বিদ্রুপ-উপহাস না করে। কেননা সে উপহাসকারী অপেক্ষা শ্রেষ্ট হতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষরোপ করোনা এবং একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না। কেউ ঈমান আনার পর তাকে মন্দ নামে ডাকা গুনাহ। (সূরা হুজরাত ঃ ১১)

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, একজন মানুষের অসৎ হবার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে তার কোনো ভাইকে তুচ্ছজ্ঞান করবে।

---

১. আবু দাউদ ও তিরমিযী কর্তৃক বর্ণিত, তিনি হাদীসটি হাসান বলে মন্তব্য করেছেন। হাদীসটি নাসায়ীও বর্ণনা করেছেন বাহায ইবনে হকিম থেকে, তিনি তার বাবার সূত্রে দাদা থেকে।

একবার আয়শা (রা) তার এক সতিনের কথা নবী করীম (স)-এর সামনে আলোচনা করলেন। তার দোষ আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বেটে এ কথা বললেন, তখন মহানবী (স) বললেন, আয়শা তুমি এমন একটা কথা বলেছ তা যদি সমুদ্রের পানির সাথে মিশানো হয় তাহলে সমগ্র পানি ময়লা হয়ে যাবে।

হযরত আয়শা (রা) বলেন, আমি একবার একজন মানুষের কথা বলা ও চলা-ফেরা ইত্যাদি অভিনয় করে রাসূল (স)-কে দেখালাম, তখন তিনি বললেন, আমি চাইনা কাউকে অনুকরণ করতে, এমন কি তার বিনিময়ে আমাকে এটা ওটা দেয়া হলেও।[১]

তিন ঃ রসিকতায় যেন কোনো মুসলমানকে ভয়-ভীতির প্রদর্শন না থাকে।

আবু দাউদ আবদুর রহমান ইবনে আবু লাইলা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমাকে মহানবী (স)-এর সাহাবিগণ বলেছেন, তারা একবার মহানবী (স)-এর সাথে কোথাও যাচ্ছিলেন, তখন এক লোক তাদের মধ্য হতে দাঁড়িয়ে গেলেন। তখন তাদের মধ্য হতে এক লোক উঠে গেলেন তার সাথে থাকা একটা রসি নিলেন, রসিটি নিয়ে ভয় দেখালেন, তখন রাসূল (স) বললেন, কোনো মানুষের জন্য অপর কোনো মুসলমানকে ভয় দেখানো বৈধ নয়।

নোমান ইবনে বশির থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূল (স)-এর সাথে এক সফরে ছিলাম। তখন এক লোক তার বাহনের উপর হাঁচি দিলেন, তখন এক লোক তার আধার থেকে একটা তীর নিল, এবং লোকটাকে সর্তক করল। তখন লোকটা ভয় পেল। তখন রাসূল (স) বললেন, কোনো মানুষের জন্য কোনো মুসলমানকে ভয় দেখানো বৈধ নয়।[২] এ ঘটনার প্রেক্ষাপট থেকে বুঝা যায়, যে লোকটি ভয় দেখিয়ে ছিল তিনি রসিকতা করছিলেন।

অপর এক হাদীসে আছে, তোমাদের কেউ তার ভাইয়ের কোনো জিনিস খেলাচ্ছলে বা সেচ্ছায় নেবে না।[৩]

চার ঃ যেখানে গুরুগম্ভীর থাকা প্রয়োজন সেখানে রসিকতা করবে না। যেখানে কান্নার উদ্রেক হওয়া দরকার সেখানে হাসবেনা, কারণ সব কিছুর জন্য একটা সময় নির্ধারিত আছে, আর সব কিছুর একটা স্থানও আছে। স্থান কাল পাত্র ভেদে কথা বলতে হয়, উপযুক্ত স্থানে যথাযথ কর্মটি করার নামই প্রজ্ঞা।

---

১. আবু দাউদ ও তিরমিযী কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ।
২. তাবারানী কতৃক "আল কবির" নামক গ্রন্থে বর্ণিত, এর রাবীগণ নির্ভরযোগ্য।
৩. তিরমিযী কর্তৃক বর্ণিত, তিনি হাদীসটি হাসান বলে মন্তব্য করেছেন।

কবিদের প্রশংসিত বক্তব্য হলো ঃ

اذا جدعند الجد أرضاك جده - وذوباظل ان شئت الهاك باطله

গুরুগম্ভীর স্থানে গম্ভীর থাকলে তোমার গাম্ভীরতা তাকে সন্তুষ্ট করবে। আর রসিক ও তামাশাকারীর তামাশা তুমি চাইলে তোমাকে আনন্দ দেবে।

আর এক কবি বলেন ঃ

اهازل حيث الهزل يحسن بالفتى - وانى اذا جد الرجال لذوجد

আমি তামাশা ও রসিকতা করি যেখানে রসিকতা যুবকের জন্য মানানসই হয়। আর লোকেরা যখন গুরুগম্ভীর হয় তখন আমি গুরুগম্ভীর হয়ে যাই।

আসমায়ী বর্ণনা করেন, তিনি একদা এক গ্রামে এক মহিলাকে তার সালাতের স্থানে দাঁড়িয়ে খুশু খযুর সাথে সালাত আদায় করতে দেখলেন। যখন সালাত শেষ করলে, তখন দেখলেন যে, মহিলাটি আয়নার সামনে দাড়িয়ে সাজগোজ করছেন। তখন তিনি তাকে বললেন, এ অবস্থা আর ঐ অবস্থার মধ্যে সামঞ্জস্য কোথায় ? তখন মহিলাটি কবিতার এই লাইনটি আবৃত্তি করল।

ولله منى جانب لاضيعه - وللهومنى والبطالة جانب

আমার ওপর আল্লাহ্‌র একটা দিক (অধিকার ও হক) আছে, আমি সেটা নষ্ট করিনা, আর আনন্দ বিনোদনের জন্য আমার একটা সময় আছে।

রাবী বলেন, তখন আমি বুঝতে পারলাম তিনি একজন এবাদতকারী মহিলা, তার স্বামী আছে তিনি তার জন্য সাজগোজ করেন।

আল্লাহ্ মুশরিকদের নিন্দা করেছেন একথা বলে যে, তারা আল-কুরআন শুনে হাসাহাসি করত। অথচ তাদের কর্তব্য ছিল কান্না করা। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেনঃ

اَفَمِنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ تَعْجَبُوْنَ - وَتَضْحَكُوْنَ وَلَا تَبْكُوْنَ - وَاَنْتُمْ سٰمِدُوْنَ -

তোমরা কি এ বিষয়ে আশ্চর্য বোধ করছ এবং হাসছ ? ক্রন্দন করছনা, তোমরা ক্রিড়া-কৌতুক করছ। (সূরা নাজাম ৫৯-৬১)

পাঁচ ঃ রসিকতা অবশ্যই যৌক্তিক পরিমাণে ন্যায়নীতির সীমার মধ্যে হতে হবে, যা সুস্থ মানব স্বভাব গ্রহণ করে। এবং সুস্থ বিবেক বুদ্ধির কাছে গ্রহণযোগ্য হয়। এবং ক্রিয়াশীল ইতিবাচক সমাজের সামঞ্জস্যশীল হয়।

ইসলাম বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্গন সর্বক্ষেত্রে অপছন্দ করে। এমনকি এবাদত বন্দেগীতেও। আর যদি হাসি ও তামশা ও রসিকতায় হয় তাহলে ব্যাপারটি সহজেই অনুমেয়।

এ কারণেই নবী (স)-এর শিক্ষা হলো বেশি বেশি হাসাহাসি করোনা, কারণ বেশি হাসাহাসী হৃদয়েকে হত্যা করে। কাজেই বুঝা গেল, নিষিদ্ধ হবে বেশি পরিমাণ ও সীমালঙ্গন।

হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেন, "কথাবার্তায় অতটুকু রসিকতা কর যতটুকু খাবারে লবন দিয়ে থাক।" তার এ বক্তব্য প্রজ্ঞাপূর্ণ। এ বক্তব্য বুঝায় লবনের মতো রসিকতাও অবশ্যকীয় বিষয়। তবে তার পরিমাণ বেশি হলে তার ক্ষতিও কম নয়।

সবসময় মধ্যম নীতি অবলম্বনই উত্তম। এটাই ইসলামের শিক্ষা ও বড় বৈশিষ্ট্য, এবং অন্যান্য উম্মতের ওপর ইসলামী উম্মাহর শ্রেষ্টত্বের চাবিকাঠি।[১]

---

১. দেখুন আমাদের ফতোয়া মুয়াছারা (দারুল ওফা) খ. ২ পৃ. ৪৫৭

খেলাধুলা

খেলাধুলার প্রয়োজনীয়তা

মানুষ জেনেছে যে, গান মানুষের শ্রবণ ইন্দ্রিয়কে আলোকিত করে আর চিত্র ও অংকন শিল্প দর্শন ইন্দ্রিয়কে তৃপ্ত করে আর কৌতুক ও কমেডি শিল্প মানুষের মুখে হাসি ফোটায়। মানুষ একাথাও জানতে পেরেছে যে, আরও কিছু শিল্প আছে যা জীবনের হতাশা ও দুঃখ-দুর্দশা এবং মনের অস্বস্তি দূর করে। আর এসব প্রতিভাত হয় বিভিন্ন খেলাধুলার মাধ্যমে যা আমরা জানি আর যা জানিনা। যা এক দিক থেকে অবসর সাময়কে ভরিয়ে দেয়, অন্য দিক থেকে নানান উপকার ও কল্যাণ করে।

বিভিন্ন জাতিগুষ্ঠির নানান খেলাধুলা

এসব খেলাধুলার মধ্যে কিছু কিছু শারীরিক ব্যায়ামের মধ্যে পড়ে। যেমন ঃ সাতার, দৌঁড়, বিভিন্ন ধরনের জাম্পিং, কুস্তি বা বলি খেলা, নানার ধরনের বল খেলা, গল্ফ, হকি ইত্যাদি। আর কিছু খেলা সামরিক বাহিনীর শরীর চর্চার মতোই, যেম, বল্লম নিক্ষেপ, তরবারী চালানো, ঘোড় দৌঁড় ইত্যাদি।

আর কিছু খেলা মানসিক প্রশান্তি ও সময় কাটানোর জন্য, আবার তার মধ্যে কিছু আছে বুদ্ধিমত্তার বিকাশ ঘটায়। যেমন দাবা, সিজা, ডমিনৌ ইত্যাদি। এর মধ্যে আবার কিছু ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে যথা ঃ পাশা খেলা (লুডু ক্র্যাম ইত্যাদি)

এসব খেলার মধ্যে কিছু কিছু একক ভাবে খেলা যায় আবার কিছু খেলার জন্য প্রয়োজন অন্তত দুজন লোক। যেমন কুস্তি, রেসলিং, আর কিছু খেলার জন্য প্রয়োজন দু দল লোকের যেমন রশি টানাটানি। এটা একটা প্রাচীন জাতীয় খেলা। তেমনিভাবে বল খেলাও।

এর মধ্যে কিছু খেলায় প্রতিযোগিতা থাকে দুজনের মধ্যে কিংবা দুই দলের মধ্যে কিংবা অনেক লোকের মাঝে অথবা অনেক গুলো দলের মধ্যে। আবার এসব খেলার মধ্যে কিছু থাকে যাদু নির্ভর কিংবা হাতের কারসাজী নির্ভর অথবা ভেল্কিবাজি সম্বলিত।

আর এসবের মধ্যে কিছু খেলা আছে শারীরিক কসরত নির্ভর। যেমন যা সার্কাসে প্রদর্শিত হয়ে মানুষকে হতবাক করে। এসবের মধ্যে থাকে অসাধারণ নৈপূণ্যতা, শৈল্পিকতা এবং বিস্ময়কর সাহসিকতা ও শক্তিমত্তা।

আবার কিছু খেলায় মানুষ পশু-পাখী ইত্যাদিকে কাজে লাগায়। যেমন কবুতর খেলা, মোরগ লড়াই, গরু-মহিসের লড়াই ইত্যাদি। এ ধরনের আর এক খেলা হলো বানর ও ভল্লুককে প্রশিক্ষণ দানের মধ্যমে তাদের দ্বারা প্রদর্শিত খেলা— যা চমৎকার নৈপূণ্যপূর্ণ। তেমনি ঘোড়ার নৃত্য, হাতির লম্প জম্প ইত্যাদি। এর চেয়ে আরো বেশি আশ্চর্যজনক হলো বাঘ, সিংহ ও নেকড়ে ইত্যাদির খেলা।

মিসরের মতো দেশের বিভিন্ন জাতীয় উৎসবে, ঈদে পার্বনে ও বিভিন্ন উপলক্ষে অনেক ধরনের খেলা মানুষ প্রদর্শন করে ও দেখে। যা তারা ঐতিহ্য হিসেবে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে।

প্রত্যেক জাতির কাছেই এরূপ অনেক ধরনের খেলাধুলা রয়েছে। তার মধ্যে তারা কিছু উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে, আবার কিছু নিজেরা আবিষ্কার করেছে।

এক্ষেত্রে নতুনত্ব আনয়ন ও নবসৃষ্টির জন্য দরজা খোলা রয়েছে। যেমন আমারা জামার্নির বিভিন্ন খেলায় ও প্রতিযোগিতা মূলক অনুষ্ঠানে প্রদর্শিত বহু খেলা টেলিভিশনের পর্দায় দেখতে পাই। এ সবের মধ্যে অনেক খেলা হাসি-ঠাট্টার খোরক যোগায়।

জাপানীরা এদের সাথে সম্ভবত এসব খেলায় প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। তারাও অনেক ধরনের খেলা আবিষ্কার করেছে।

এখানে বড় প্রশ্নটি হলো এসব খেলা-ধুলা প্রসঙ্গে ইসলামের অবস্থান কি ?

খেলাধুলা প্রসঙ্গে ইসলামের অবস্থান

এসব খেলাধুলা সম্বন্ধে ইসলামের অবস্থান কি তা স্পষ্ট হয় নিন্মোক্ত বিষয়গুলো থেকে।

ইসলাম যেসব খেলার অনুমোদন দেয়

বিভিন্ন প্রকারের খেলাধুলাকে ইসলাম নিষেধ করেনা। বরং ইসলাম এসব খেলাধুলাকে বৈধ মনে করে। ইসলাম মনে করে ব্যক্তির যেমন এসবের প্রয়োজন আছে, তেমনি সমষ্টিরও এসবের প্রয়োজন আছে। তবে খেলাধুলার উদ্দেশ্য হবে কেবল মনতুষ্টি কিংবা হাস্যরস অথবা রসিকতা করা। আমরা ইতিপূর্বে গান বৈধ হওয়া প্রসঙ্গে এবং হাস্যরস বৈধ হওয়া সম্পর্কে যেসব আলোচনা করেছি এবং ইমাম গাজালী ও ইবনে হাযম ইত্যাদির যে সব অভিমত নকল করেছি তা সবই এসব খেলাধুলা সম্বন্ধেও উল্লেখ করা যায়।

বরং এমন কিছু খেলাধুলা আছে ইসলাম যাকে উৎসাহিত করে। যেমন সেসব খেলাধুলা যা শরীর চর্চার অন্তর্ভুক্ত, কিংবা সামরিক কুচকাওয়াযের আওতাভুক্ত।

কারণ এসবের মাধ্যমে শারীরিক কসরত হয়, অভিজ্ঞতা অর্জিত হয় এবং শারীরিক ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

হাদীস শরীফে তীর নিক্ষেপ, ঘোড়া দৌড়ানো ইত্যাদিকে উৎসাহিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে শক্তিশালী মুনিন আল্লাহ্র কাছে দুর্বল মুমিনের চেয়ে অধিক প্রিয়।

ইসলাম ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা এই দুটি দিন উপহার দিয়েছে এমন দুটি দিনের বিপরীতে যে দুদিন আনসাররা খেলাধুলা করত।

নবী করীম (স) ঈদের দিন হাবশীদেরকে তার মসজিদে তীর-বল্লম নিয়ে খেলাধুলা ও নৃত্য করার অনুমুতি দিয়েছিলেন। তাদেরকে উৎসাহিত করতে গিয়ে বলেছিলেন, "আরফাদার ছেলেরা সামনে এগিয়ে চলো।" যা আমরা পূর্বেও আলোচনা করেছি।

ইসলাম যেসব খেলাধুলা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে

ইসলাম কিছু কিছু খেলাধুলা সম্পর্কে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি রাখে। যেসব খেলাধুলা ইসলামের উদ্দেশ্য ও বিধিবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক। যেমন ঃ

১. যেসব খেলাধুলায় বিনা প্রয়োজনে এমন সব কাসরত পরিবেশন করা হয় যাতে কারো না কারো মারাত্মক ক্ষতি হবার সম্ভাবনা থাকে। যেমন রেসলিং, এ খেলায় নিজেকে এবং অপরকে মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন করা হয় বিনা প্রয়োজনে।

২. যে সব খেলাধুলায় নারী দেহের এমন সব অঙ্গের প্রদর্শন করা হয় যা খোলা পরপুরুষের সামনে তাদের জন্য বৈধ নয়। যেমন সাতার ইত্যাদি। নারীরা যদি এসব খেলাধুলায় (অংশ গ্রহণ করেতেই চায়) তাহলে তাদের জন্য আলাদা খেলার স্থান ও সাতারের স্থান থাকা অবশ্যক যেখানে কোনো পুরুষ থাকবেনা। (আর তারাও রুচিশীল পোশাক পরে খেলবে)

৩. যেসব খেলাধুলায় সত্যিসত্যি যাদু থাকে। কারণ যাদু সাতটি কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই তা শিখা, চর্চা করা ও প্রদর্শন করা হারাম।

৪. যেসব খেলাধুলায় ধোকা-প্রতারণার মাধ্যমে মানুষের অর্থ আত্মসাৎ করার ব্যবস্থা থাকে। যেমন জুয়া খেলা (লটারী) ইত্যাদি।

৫. যেসব খেলাধুলায় পশু-পাখীকে নানান রকমের কষ্ট দেয়া হয়। যেমন ঃ মোরগের লড়াই, গুরু বা সাড়ের লাড়াই ইত্যাদি। রাসূল (স) থেকে সহীহ সনদে পশু-প্রাণীর মধ্যে লড়াই দিতে নিষেধবাণী বর্ণিত আছে। সুতরাং যেসব

খেলাধুলা নির্বোধ পশু-পাখীর রক্ত ঝরায় তা দেখে আনন্দ উপভোগ করা মানুষের জন্য বৈধ হতে পারে না। "যে অপরের প্রতি দয়া করেনা তার প্রতি দয়া করা হবে না।"

৬. যেসব খেলাধুলা কেবল ভাগ্যের ওপর নির্ভরশীল যেমন পাশা খেলা। মিসরবাসী তাকে টেবিল খেলা বলে। তাছাড়া যেসব খেলায় মানুষের মেধা খোলে বুদ্ধিমত্ত্বার বিকাশ হয় যেমন দাবা খেলা, এ খেলাগুলো অগ্রধিকার প্রাপ্ত মতানুসারে কিছু শর্তসাপেক্ষ বৈধ। যেসব শর্ত আমি "ইসলামের হালাল হারামের বিধান" ও "ফতোয়া মুয়াছেরা" নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে আলোচনা করেছি।

৭. যেসব খেলায় জুয়া আছে। কারণ জুয়াকে আল-কুরআনে মদের সাথে আলোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে তা নাপাক শয়তানের কারসাজির ফল।

৮. যেসব খেলায় মানুষের মর্যাদা ভুলুণ্ঠিত করা হয়, তাকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা হয়, তাকে অন্যের হাসি-তামাশার টার্গেট বানানো হয়। তাতে ব্যক্তি বিশেষকে টার্গেট করা হোক কিংবা দল বা গুষ্টি বিশেষকে টার্গেট করা হোক যেমনঃ অন্ধ, লেংড়া, কালো অথবা পেশা বিশেষের লোকদেরকে টার্গেট করা হয়, সেসব খেলাও বৈধ নয়। তবে দেশের সাধারণ প্রথানুযায়ী যতটুক সমর্থনযোগ্য তা বৈধ ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰٓى أَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّنْ نِّسَآءٍ عَسٰٓى أَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ

হে মুমিনরা কেউ যেন অপর কাউকে নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ না করে, হতে পারে সে তার চেয়ে উত্তম। (সূরা হুজরাত ঃ ১১)

৯. খেলাধুলায় অতিরঞ্জন বৈধ নয়। কারণ খেলাধুলা সৌন্দর্য বর্ধক জিনিসের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তা প্রয়োজনীয় কাজের চেয়ে বেশি গুরুত্ব পাওয়া বাঞ্চনীয় নয়। আর যদি তা জরুরী কাজের চেয়ে বেশি গরুত্ব পেয়ে থাকে তাহলে কি হুকুম হতে পারে তা অনুমেয়। সব বৈধ কাজ বৈধ হয় অতিরঞ্জন পরিহারের শর্ত সাপেক্ষ। কারণ আল্লাহ্‌র তা'আলা অতিরঞ্জনকারীকে পছন্দ করেন না। তেমনিভাবে তা বৈধ হয় তার কারণে কোনো দুনিয়াবী কিংবা দ্বীনী ওয়াজিব কর্ম ব্যহত না হবার শর্ত সাপেক্ষ। মুসলিম সমাজ ও মুসলিম ব্যক্তির কাছে কাম্য হচ্ছে তার কাছে কাঙ্ক্ষিত জিনিসের মধ্যে যেন সে ভারসাম্য রক্ষা করে। তারা যেন প্রত্যেককে তার অধিকার যথাযথভাবে দিয়ে দেয়।

এ কারণেই ইসলামের আলোকে একটা খেলা যেমন ফুটবল খেলা সমগ্র খেলাধুলা ও শরীর চর্চার ওপর প্রাধান্য লাভ করবে তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। এবং এসবের চেয়েও অনেক অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ যথা আল্লাহ তা'আলার এবাদতের চেয়ে বেশি গুরুত্ব পাবে তাও হতে পারে না। পৃথিবী আবাদ ও মানুষের অধিকার রক্ষার চেয়েও বেশি গুরুত্ব পেতে পারে না। কিন্তু কোনো দেশে কখনও কখনও তা যেন পুঁজনীয় মূর্তিতে পরিণত হয়। মানুষ তার পূজা করে। একজন খেলোয়াড় লক্ষ কোটি টাকার বিনিময়ে বিক্রি হয়, কখনও মিলিয়ন বিলিয়ন টাকার বিনিময়ে বিক্রি হয়। অন্য দিকে কোনো কোনো চিন্তাশীল বুদ্ধিজীবী ভাত কাপড় পায় না। কারণ পায়ের ক্ষমতা মাথার ক্ষমতার চেয়ে বেশি। তাদের কার্যকলাপ প্রমাণ করে মানুষের মূল্যায়ন নিম্নাঙ্গ নিয়ে উপরাঙ্গ নিয়ে নয়।